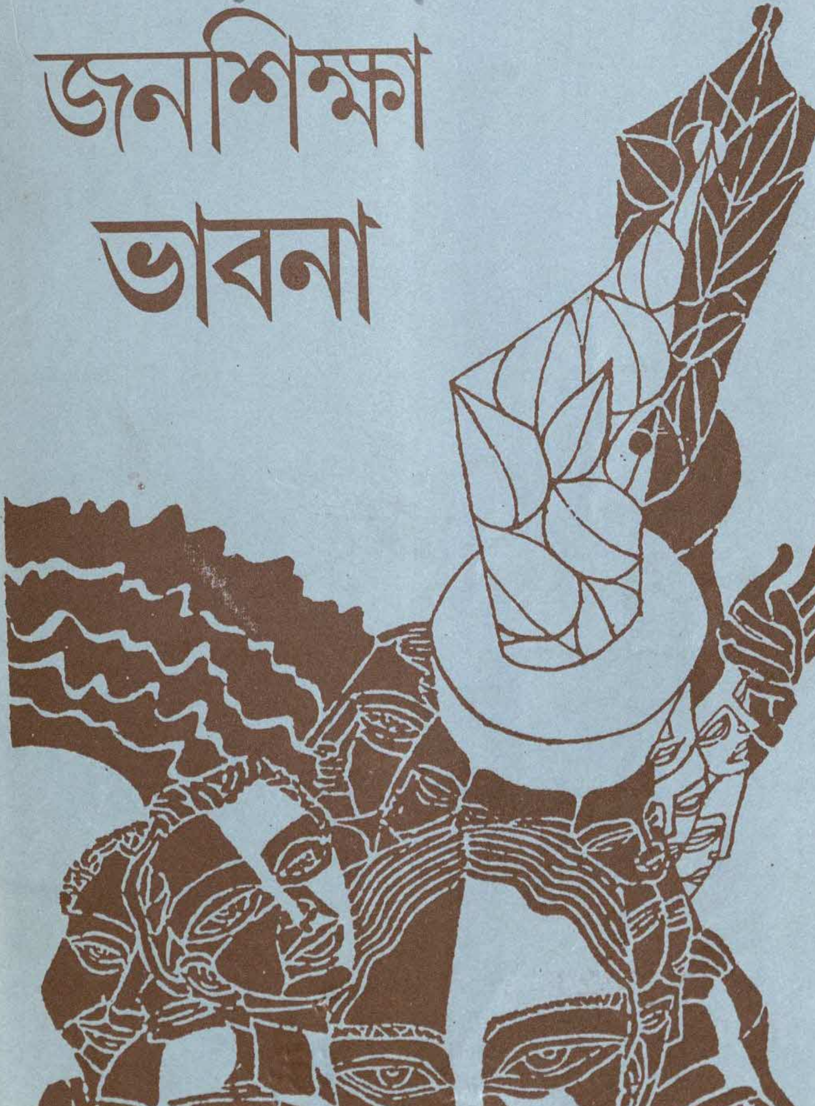
জনশিক্ষা ভাবনা



কেন এই পত্রিকা?

সারা ভারত জুড়ে এখন চলছে জনশিক্ষার অভিযান। চলছে সাক্ষরতার নানা প্রয়াস। আমাদের রাজ্যেও এই অভিযানের মাধ্যমে সাক্ষর হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের সচেতনতা বাড়ছে, দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। এঁরা যদি আরও এগিয়ে চলার গতিপথ না পান, এঁদের উদ্বুদ্ধ চিন্তাশক্তি যদি বিশ্লেষণী ক্ষমতায় শাণিত না হয়ে ওঠে, তবে এঁদের সৃজনশীলতা প্রায় শূন্যতায় পর্যবসিত হবে। সাক্ষরতা বাড়বে, কিন্তু সমাজ স্থিতাবস্থায় থাকবে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হাজার বছরের পুরোনো মতকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে। এ থেকে মুক্তির জন্য চাই চিন্তার তীক্ষ্ণতা, ভাবনার স্বচ্ছতা, চাই প্রবহমান শিক্ষার এক নিরন্তর স্রোত। এই পত্রিকা হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে মত-বিনিময় ও বিতর্কের একটি মঞ্চ — এই আমাদের আশা।

কীভাবে রচনা পাঠাবেন?

সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছেন, তাঁদের কাছে এই আন্দোলনের নানা দিক সম্বন্ধে রচনা পাঠাবার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। সাদা কাগজের একদিকে পৃষ্ঠার ডানদিকের দুই তৃতীয়াংশে স্পষ্টাক্ষরে নাতিদীর্ঘ লেখা চাই। প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর বিবেচনাকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করতে হবে। প্রকাশিত রচনাগুলিতে যে মত ব্যক্ত হয়, তা লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মতের মিল নাও থাকতে পারে।

কীভাবে গ্রাহক হবেন?

বছরের যে কোনো সময় থেকে পত্রিকাটির গ্রাহক হওয়া যায়। বছরে চারবার এটি প্রকাশিত হয়। সরাসরি নিলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দশ (১০.০০) টাকা। নিম্ন ঠিকানায় ডাকযোগে টাকা পাঠিয়েও গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক সডাক গ্রাহক মূল্য চল্লিশ (৪০.০০) টাকা। দুই, তিন বা চার বছরের গ্রাহকও হওয়া যায়। এককালীন এক হাজার (১০০০.০০) টাকা জমা দিয়ে পত্রিকাটির আজীবন গ্রাহক হওয়া যায়।

কর্মাধ্যক্ষ, ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিভাগ
সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি
২৫/২, বারোয়ারিতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০
দূরভাষ : ২৫৫৮-২২৮৯

'সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি' কেন?

জনশিক্ষার জগতে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব সত্যেন মৈত্রর নামাঙ্কিত আমাদের প্রতিষ্ঠান 'সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি'। গত ৬ এপ্রিল ২০০০ তারিখে ট্রাস্ট হিসাবে এই সমিতি সরকারিভাবে নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

৫ জুন ১৯৯৬ তারিখে সত্যেন মৈত্র প্রয়াত হবার পর তাঁর স্মৃতি ও আদর্শকে অম্লান রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি। সত্যেন মৈত্রর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমরা পেয়েছি। তাঁর কাছে আমরা শিখেছি, তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে ও আদর্শ নিষ্ঠায় আমরা প্রাণিত হয়েছি। তাঁর স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন আমরা বোধ করেছি। তাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা ও বিকশিত করাকে সমাজ-স্বার্থের একান্ত অনুকূল বলে আমরা মনে করেছি। তাঁর গুণমুগ্ধ ও জনশিক্ষায় আগ্রহী বহু মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতায় কয়েক বছর আগেই আমাদের সমিতির সূচনা হয়েছে। বেশকিছু কাজ আমরা ইতিমধ্যেই আরম্ভ করেছি। চারটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যেতে চাইছি ঃ

(১) সত্যেন মৈত্রর স্মৃতি রক্ষা।

(২) জনশিক্ষার চলমান কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ।

(৩) জনশিক্ষা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ।

(৪) গবেষণামূলক কাজ।

এই লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি।

জনশিক্ষা ভাবনা

দ্বিতীয় বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

বয়স্ক শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস কোন যুক্তিতে?

আগামী ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে ইতিমধ্যে নানা আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যয়বরাদ্দে শিক্ষাখাতে ধরা হয়েছে ২৪,১১৪ কোটি টাকা। বিদায়ী বছরের থেকে বরাদ্দ বেড়েছে ৫,৭৭৭ কোটি। বরাদ্দ বেড়েছে মূলত সর্বশিক্ষা অভিযানে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মধ্যাহ্নকালীন আহারের জন্যে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাখাতেও কিছু বরাদ্দ বেড়েছে। কারিগরি শিক্ষা ও ভাষা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বেড়েছে যৎসামান্য। আর বয়স্ক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমেছে ৪৯ কোটি টাকা। বিদায়ী বছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২৬৩ কোটি টাকা। ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের জন্য বরাদ্দ ২১৪ কোটি টাকা। জনশিক্ষার অনুরাগী যে কোনও মানুষই যে এতে আশাহত হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সরকারের ব্যাখ্যা হল, ১৯৯০ সাল থেকে সার্বিক সাক্ষরতার যে অভিযান শুরু হয়েছিল, তা দেশের সব প্রান্তেই শেষ হয়ে এসেছে। এখনও পর্যন্ত দেশের মোট ৬০০টি জেলার মধ্যে মাত্র ৩টি জেলাতে এই অভিযান শুরু হতে বাকি আছে। আর ১৩৬টি জেলাতে এই অভিযান কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। অন্য জেলাগুলি এই পর্যায় অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে গেছে। কাজেই বয়স্ক শিক্ষার খাতে আর আগের মতো বরাদ্দ দরকার নেই।

সন্দেহ নেই যে বিগত দেড় দশকে দেশজোড়া গণ-সাক্ষরতার জোয়ার অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। সাক্ষরতার হার বেড়েছে অভূতপূর্ব গতিতে। নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হারে পার্থক্য কমেছে। সকলের জন্যে শিক্ষার এক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক চেতনার

ক্ষেত্রেও এর সুফল দেখা যাচ্ছে। সারা দেশে এই প্রথম নিরক্ষর মানুষের তুলনায় সাক্ষর মানুষের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু তাতে কি বয়স্ক শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমানোর কোনও কারণ ঘটেছে?

অনেকে বয়স্ক শিক্ষাকে সাক্ষরতার সমার্থক বলে গণ্য করেন। কিন্তু বাস্তবে বয়স্ক শিক্ষার পরিধি অনেক ব্যাপক। একথা ভুললে চলবে না, সারা দেশে এখন ২৯৬টিরও বেশি জেলাতে চলছে প্রবহমান শিক্ষা। সাক্ষরতার অভিযান শেষ করে অন্যান্য জেলাগুলিও ক্রমে এই স্তরে এসে প্রবেশ করছে। সাক্ষরতার স্তর অতিক্রম করে বয়স্কশিক্ষা ক্রমে জনশিক্ষার রূপ পরিগ্রহ করছে। এর ধারাবাহিকতা রক্ষার দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারে না। এছাড়া সাক্ষরতার হার বাড়ার পরও দেশে যে ৩৫% নিরক্ষর মানুষ আছেন, তাঁদের সাক্ষরতার জন্যে প্রয়াসকে অব্যাহত রাখার কাজেও ঢিলেমি দিলে চলবে না।

এছাড়া আমাদের স্মরণে রাখা দরকার, যে প্রবহমান জীবনব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি (CLEP)-কে একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে—শুরুতে এটিই ছিল সরকারি ঘোষণা। বাস্তব অভিজ্ঞতাও দাবি করছে যে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই হবে। কিন্তু এই বিষয়টিও এবারের বাজেট-বরাদ্দে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। সরকারকে বিষয়টি গভীরভাবেই ভেবে দেখতে হবে। আগামী একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এজন্য অর্থের যথাযথ সংস্থান করতেই হবে।

আমাদের পত্রিকা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার আছে। আমরা অন্যান্য বারের মতো এবারও পত্রিকাটিতে বেশ কয়েকটি নানা স্বাদের নিবন্ধ প্রকাশ করেছি। এগুলি সম্পর্কে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের সুচিন্তিত পর্যালোচনা কামনা করছি। পত্রিকাটির গুণগত মান ও আঙ্গিককে আরও উন্নত করার জন্যে আমরা কিছু পরিকল্পনা করেছি। আশাকরি এই উদ্যোগ সর্বত্র সমাদৃত হবে।

শব্দ !

[আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা-দিবস স্মরণে ও মননে]

নিমাই মান্না

মায়ের মুখ থেকে শেখা শব্দ-ভাষা
কখনোও বা বদলে দেয় খোল-নলচে,
বদলে দেয় দেশ এবং ভূগোলেরও রঙ।

মায়ের মুখের ভাষা
কখনোও বা গর্জন হাঁকায় ভয়ানক কামানের থেকেও,—
যুদ্ধের ডাক দেয়, ভেঙে দেয় গুঁড়ো করে
হানাদার ইবলিসের গ্রানিট্-চোয়াল,
গৃহবাসী মানুষকেও টেনে আনে সংগ্রামের বিশাল বলয়ে,
প্রশস্ত রাজপথ বুকে
হাতে-হাত, গানে-গান
প্রাণে-প্রাণ উচ্ছল আবেগ জোয়ার।

শব্দের আণবিক শক্তি
গড়ে তোলে নয়া দেশ — নতুন অধ্যায়;
জন্ম দেয় বহমান জীবনের
অগ্নিময় ইতিবৃত্তের আশ্চর্য নতুন অধ্যায়।।

যুগ সন্ধিক্ষণে বয়স্কশিক্ষা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ

আফজাল হোসেন

'Life without dreams may be possible,
but human existence and history without dreams are not.'
— Paulo Freire

১. বয়স্ক শিক্ষার ধারণা ঃ

বয়স্কশিক্ষার পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঐক্যমত নেই। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে শ্লোভেন অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার পৃথিবীর সেরা বয়স্ক শিক্ষাবিদদের নিয়ে উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বয়স্কশিক্ষার ধারণাগত পুনর্মূল্যায়নের এক সমীক্ষা চালায়। বয়স্কশিক্ষার ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছয়টি মূল বিষয়ে তাঁদের মতামত চাওয়া হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সহমত পোষণ করেন নি। তবে একটি বিষয় সুস্পষ্ট তা হল, বয়স্কশিক্ষার ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো মতামত সংশ্লিষ্ট দেশের বয়স্কশিক্ষার বিকাশের ইতিহাস এবং উন্নয়নের স্তরের উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নত দেশের বয়স্ক-শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের বয়স্কশিক্ষার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। উন্নত দেশে বয়স্কশিক্ষা অনেকটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বয়স্কশিক্ষা অনেকটাই সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত।

বয়স্কশিক্ষার ধারণাগত পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঐক্যমত না থাকলেও একথা বলা যায় যে, বয়স্কশিক্ষা কেবলমাত্র বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষরতা নয়। ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বয়স্কশিক্ষার নামে বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। একজন নিরক্ষরের পক্ষে পরিকল্পিতভাবে শেখা বা শিক্ষাগ্রহণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। আর সেজন্যই অধিকাংশ নিরক্ষর অধ্যুষিত এই দেশগুলিতে বয়স্কশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে বয়স্ক সাক্ষরতার কাজই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বয়স্কশিক্ষার মূল লক্ষ্য হল বুনিয়াদি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষদের বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণার প্রেক্ষাপটে এবং পেশাগত জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রভাবের

ফলে বয়স্কদের জন্য প্রবহমান শিক্ষাও বয়স্কশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ব্যাপক অর্থে বয়স্কশিক্ষা বলতে বয়স্কদের জন্য যেকোনো পরিকল্পিত শিক্ষাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে বয়স্করা শেখার সুযোগ পায়। এ শেখার তিনটি দিক : (ক) অধীত বিষয়কে রপ্ত করা; (খ) বিশেষ দক্ষতাকে আয়ত্ত করা যার মধ্যে পড়া, লেখা ও অংকের দক্ষতাও অন্তর্ভুক্ত এবং (গ) বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সৃষ্টি। প্রথম দুটি বিষয়ের সঙ্গে তৃতীয় বিষয়টির ভারসাম্য না থাকলে যুক্তি এবং আবেগের ভারসাম্য থাকে না। এই ভারসাম্য রেখেই **১৯৭৬** সালে UNESCO বয়স্কশিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছে, ব্যাপক পরিসরে আজও তা গ্রহণযোগ্য :

The term 'adult aducation' denotes the entire body of organised educational processes, whatever the content level and method, whether formal or otherwise, whether they prolong or replace initial education in schools, colleges and universities as well as in apprenticeship whereby persons regarded as adult by the society to which they belong develop their abilities, enrich their knowledge, improve their technical or professional qualifications or turn them in a new direction and bring about changes in their attitudes or behaviour the two-fold perspective of full personal development and participation in balanced and independent social, economic and cultural development.

১৯৯৭ সালে জার্মানির হামবুর্গ শহরে ইউনেস্কো আয়োজিত বয়স্কশিক্ষার পঞ্চম বিশ্বসম্মেলনে বয়স্কশিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর চাবিকাঠি বলা হয়েছে। এই সম্মেলন বয়স্কশিক্ষার উপরিউক্ত সংজ্ঞাকেও পরিমার্জিত করে বলেছে—

Adult education denotes the entire body of ongoing learning processes formal or otherwise, whereby people regarded as adults by the society to which they belong develop their abilities, enrich their knowledge, and improve their technical or professional qualifications or turn them in a new direction to meet their own needs and those of their societies. Adult learning encompasses both formal and continuing education, non-formal learning and the spectrum of informal and incidental learning available in

a multi cultural learning society, where theory and practice based approaches are recognised.

লক্ষণীয় বিষয় হল বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বয়স্কশিক্ষার চেয়ে বয়স্কদের শেখার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তা প্রতিষ্ঠা পায়। এ বিষয়টি সুগভীর বিতর্কের দাবি রাখে।

২. বয়স্কশিক্ষা অথবা বয়স্কদের শেখা ?

শিক্ষা হল বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে শেখার প্রক্রিয়া। শেখা শিক্ষারই একটি অঙ্গ। শেখা হল জ্ঞান, দক্ষতা, উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে পরিবর্তন নিয়ে আসা। এই পরিবর্তনের কিছু ইচ্ছাকৃত যেমন হতে পারে তেমনি কিছু অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। শিক্ষার জন্যে প্রয়োজন পরিকল্পনা, শিক্ষার্থী এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য। শেখার মধ্যে শিক্ষার্থীর যে পরিবর্তন ঘটে শিক্ষা তাকে স্থায়ী করতে চায়। শেখা অনেক সময় যান্ত্রিক হতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করবার মধ্যে মানুষে মানুষে গতিশীল সম্পর্ক তৈরি হয়। বয়স্কদের শেখার ওপর যাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁদের বক্তব্য শিক্ষার মধ্যে কিছু 'সত্য'-কে শেখানো হয় এবং শিক্ষার্থী সেখানে কর্তা হতে পারে না। কর্ম সম্পাদনের উপায় হিসেবে থাকে। তাছাড়া স্থায়ী সত্য বলে কিছু নেই। কোনও বয়স্ক যখন শেখে তখন সে নিজেই কর্তা এবং কোনও স্থায়ী 'সত্য' শেখার বাধ্যবাধকতা তার নেই। তাই এখানে সে অনেক স্বাধীন এবং বয়স্কদের শেখার ধারণা অনেকটা মুক্তিকামী।

আপাত এই মুক্তিকামী দৃষ্টিভঙ্গির উল্টোদিকটা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষার পরিবর্তে শেখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলে এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক জোটবদ্ধতার পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রীকরণ বেশি প্রশ্রয় পায়। তাছাড়া এখানে শিক্ষার পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে শিক্ষার্থীকে পৃথক করা হয়। এই অর্থে মুক্তি সামাজিক নয়, ব্যক্তির সক্ষমতা সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়। এরকম ধারণা অনৈতিহাসিক এবং মতাদর্শগত দিক থেকে রক্ষণশীল। আসলে পুঁজির বিশ্বায়নের ফলে ব্যক্তিকে কেবল ভোক্তা হিসাবে প্রতিপন্ন করে তার নাগরিক ও সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার করবার প্রয়াসের মধ্যেই বয়স্কদের শেখার ধারণা পুষ্ট হয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি বয়স্কশিক্ষার চেয়ে

বয়স্কদের শেখার ওপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে। শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক পরিষেবা থেকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রত্যাহারের দর্শনের সঙ্গে এরকম ধারণার সাযুজ্য সুগভীর। এর মাধ্যমে বাজার এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি যৌথভাবে সহজেই ব্যক্তির নিজস্ব জগতে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বয়স্কশিক্ষার ধারণাই অধিক গ্রহণযোগ্য। বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন সময়ে একই দেশে বয়স্কশিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত ভিন্নতর হয় আবার একই সময়ে বিভিন্ন দেশেও এই পরিপ্রেক্ষিত এক হয় না।

৩. বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ঃ

বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব নানা পরিসরে বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ (ক) সাংবিধানিক এবং আইনগত পরিসর থেকে বলা যেতে পারে যে সাংবিধানিক ঘোষণা কিংবা আইনগত দায়বদ্ধতার জন্য কোনো রাষ্ট্র বয়স্কশিক্ষা সংগঠিত করতে পারে। (খ) রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের জন্য কোনো রাষ্ট্রে বয়স্কশিক্ষা ব্যবহৃত হতে পারে। এর উদ্দেশ্য নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় নানা বিষয়ে সচেতন করে তোলা, (গ) রাজনৈতিক বৈধতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বয়স্কশিক্ষা ব্যবহৃত হতে পারে। বৈচিত্র্যময় দেশে কিংবা যেখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের বৈধতা দুর্বল সেখানে বয়স্কশিক্ষার মাধ্যমে এই বৈধতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হতে পারে। (ঘ) আন্তর্জাতিক স্তরে জাতীয় সম্মান রক্ষা বা আন্তর্জাতিক স্তর থেকে চাপের পরিপ্রেক্ষিত থেকেও কোনো দেশে বয়স্কশিক্ষা সংগঠিত হতে পারে। (ঙ) মুক্তিকামী সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবেও বয়স্কশিক্ষা পরিচালিত হতে পারে। (চ) মানবপুঁজিতে বিনিয়োগ হিসেবে বয়স্কশিক্ষা সংগঠিত হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখানো হয় যে বয়স্কদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে নানাভাবে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতগুলি কোনো দেশে মিলেমিশে থাকতে পারে। তবে বর্তমান আন্তর্জাতিক স্তরে আর্থিক বিশ্বায়নের ফলে মানবপুঁজিতে বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই

বর্তমানে প্রাধান্যবিস্তারী পরিপ্রেক্ষিত। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে বয়স্কশিক্ষা কিংবা মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য বয়স্কশিক্ষা সংগঠিত করবার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

৪. বয়স্ক শিক্ষার সমাজতত্ত্ব ঃ

বয়স্কশিক্ষার পরিকল্পনা, রূপায়ণ, চর্চা ও চর্যা প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষ হতে পারে না। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে যে কোনও শিক্ষা ব্যবস্থার মতো বয়স্ক শিক্ষারও একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও সংগঠনের মাধ্যমে যেমন বয়স্কশিক্ষা প্রচলিত সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে তেমনি সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেও বয়স্কশিক্ষা সাহায্য করতে পারে। বয়স্কশিক্ষার সমাজতত্ত্বের পর্যালোচনার মৌল বিষয় হল দুটি — (১) বয়স্কশিক্ষা গুণগত দিক থেকে গণতান্ত্রিক, সাম্যভিত্তিক সমাজগঠনের উপযোগী কিনা এবং (২) বয়স্কশিক্ষা প্রচলিত সামাজিক এবং আর্থিক অসাম্যকে বৈধ কিংবা আরও বৃদ্ধি করে কিনা। এই দুটি প্রশ্নকে ঘিরে দুরকমের মতামত প্রচলিত। প্রথম দল সম্মতিতত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁরা মনে করেন সামাজিক বৈষম্য সমাজের সদস্যদের সম্মতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক এই সম্মতি ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব টিকতে পারেনা। সামাজিক বৈষম্য প্রয়োজনীয় কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে উপকারীও বটে। কারণ এই বৈষম্য সমাজের অস্তিত্ব বজায় রেখে ব্যক্তির অস্তিত্ব ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করে। দ্বিতীয় দল সংঘর্ষ তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁরা মনে করেন সামাজিক বৈষম্য ক্ষমতা দখলের লড়াই এর ফসল। সংঘর্ষ ছাড়া সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না এবং খোলামেলাভাবে যেসব লড়াই দেখা যায় সেগুলি বিশাল হিমশৈলের উপরিঅংশের মতোই।

ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বয়স্কশিক্ষার লক্ষ্যদল হিসাবে প্রধানত যারা চিহ্নিত তারা সমাজের সকল প্রকার বৈষম্যের শিকার — তারা গ্রামে বা শহরে বসবাসকারী দরিদ্র, নিরক্ষর, জাতি, ভাষা বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং সকল ক্ষেত্রে অধিকাংশই নারী। তারা সকলেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মূল গণ্ডির বাইরে। বয়স্ক শিক্ষা তাদের সক্ষম ও সচেতন করে এই গণ্ডির ভিতরে নিয়ে আসবে এটাই কাম্য। তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলিতে তাই সম্মতিতত্ত্ব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই দেশগুলিতে বয়স্কশিক্ষার আমূল পরিবর্তনকামী চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. একবিংশ শতাব্দীর ঊষাকালে বয়স্কশিক্ষার প্রেক্ষাপট ঃ

বয়স্কশিক্ষার উদ্ভব হয়েছে আর্থ-সামাজিক চাহিদা থেকেই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ইউরোপে বয়স্কশিক্ষার উদ্ভব ঘটে বিশেষ কতকগুলি ঘটনা প্রবাহে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সাবেকি পেশা ছেড়ে শহরে কলকারখানায় শত শত মানুষের নতুন প্রযুক্তিগত পেশাগ্রহণ, নগরায়নের বৃদ্ধি, নৌবিদ্যা, যুদ্ধ ও বাণিজ্যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের গোড়াপত্তনের মাধ্যমে দেখা গেল যে সেখানেও নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হল বয়স্কদের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা।

একইভাবে দেখা গেল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলি নিজেদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগী বয়স্কশিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করল। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে সংকীর্ণ বা ব্যাপক অর্থে বয়স্কশিক্ষার বিস্তার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একদিকে যেমন ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুটি শিবির তৈরি হয় তেমনি মতাদর্শগত দিক থেকেও বয়স্কশিক্ষার দার্শনিক তাত্ত্বিক আলোচনা দুটি ভাগে বিভক্ত হয় ঃ একটি সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত অন্যটি পুঁজিবাদী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। দুটি দলই বয়স্ক-শিক্ষার বিস্তারে রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং পুরো সমাজের ভূমিকা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করত।

বিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রধান সংকট বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। বয়স্কশিক্ষার পরিবর্তনকামী আলোচনার স্থানে দেখা দেয় শ্রমের পেশাগত দক্ষতার আলোচনার বৃদ্ধি। এর সঙ্গে রয়েছে বিশ্ব পরিস্থিতির কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঃ

(ক) আশির দশক থেকে আর্থিক ক্ষেত্রে যে বিশ্বায়নের শুরু হয়েছে নব্বই-এর দশকে তার বাড়-বাড়ন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। একবিংশ শতাব্দীর ঊষাকালে আর্থিক বাজার এবং পুঁজির বিশ্বায়নই উন্নয়নের একমাত্র পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। আর্থিক বিশ্বায়ন ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নে। (খ) বিশ্বায়নের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা পূর্বের তুলনায় বাড়ছে বহুগুণ। পক্ষান্তরে জাতীয় অর্থনীতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিকে পরিবর্তন করে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করবার কোন সদিচ্ছা লক্ষ করা যায় না। (গ) দারিদ্র্য দূরীকরণে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কর্মসূচি থেকে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে পিছু হটছে। (ঘ) সামগ্রিক চিন্তার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমাধানের প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার কাঠামোগত দিককে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে খণ্ডিতভাবে সমস্যাকে দেখানো হচ্ছে। (ঙ) বিশ্বায়নের প্রভাবে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ মানুষ নিজের নিজের ক্ষুদ্র পরিচিতিকেই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। সাংস্কৃতিক সমজাতীয়করণের প্রভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে নিজের সংস্কৃতিকে বাঁচাবার চেষ্টায় শুরু হয়েছে জাতি বা ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। এর ফল হিসেবে এসেছে জাতিগত, ধর্মীয় ও বংশগত বিদ্বেষ।

বয়স্কশিক্ষার পঠন-পাঠন ও গবেষণার বিষয়টি বর্তমানে একটি সামাজিক বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের পরিপূরক, জাতি বিদ্বেষের পরিপূরক তাত্ত্বিক চেষ্টা যেমন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বিস্তার লাভ করেছে, বয়স্কশিক্ষার অঙ্গনও তা থেকে মুক্ত নয়। ইতিহাসের পরিনির্বান তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক সংঘাতের তত্ত্ব এবং উত্তর-আধুনিকতার নামে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সমগ্রকে খণ্ড খণ্ড করে দেখবার তত্ত্ব। একবিংশ শতাব্দীর ঊষাকালে বয়স্ক-শিক্ষার অঙ্গনে দেখানো হচ্ছে সমগ্রতা বোধগম্য নয়, সমগ্রতা ও সর্বজনীন বলে কিছু নেই এবং যুক্তিবাদ নেহাতই অতিকথা। এসবই বয়স্কশিক্ষার বৈপ্লবিক চরিত্রের মূলে আঘাত হানে। বয়স্কশিক্ষা যদি ক্ষমতাহীনকে ক্ষমতাবান করতে চায় — যা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী — তবে বয়স্কশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্বে মতাদর্শগত অবস্থানের পূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

৬. বয়স্কশিক্ষার দার্শনিক-তাত্ত্বিক ঐতিহ্য ঃ

বয়স্কশিক্ষার ঐতিহ্য প্রাচীন। কিন্তু বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য ও গুরুত্বের নানা পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে এই ঐতিহ্যকে দেখা যায়। বয়স্কশিক্ষা কী এবং কেন এর উত্তর খুঁজতে হবে এই দার্শনিক-তাত্ত্বিক ঐতিহ্যের আলোকেই। এই ঐতিহ্যকে নানাভাবে দেখা যেতে পারে। যেমন — উদারনৈতিক, প্রগতিশীল, আচরণবাদী, মানবতাবাদী, আমূল পরিবর্তনকারী এবং বিশ্লেষণাত্মক; উদারনীতিবাদী প্রগতিশীল ও তার প্রতি সমালোচনামূলক; এবং ব্যক্তি উন্নয়নকেন্দ্রিক; কেউ কেউ এই ঐতিহ্যকে এই তিন ভাবে দেখার চেষ্টা করেন। তবে এরকম বিভাজন চূড়ান্ত নয়। বয়স্ক শিক্ষার দার্শনিক-তাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে এর দুটি ধারাই সুস্পষ্ট। একটি ধারা বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীল এবং আমূল পরিবর্তনের পক্ষে। আরেকটি ধারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্তরের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তে বয়স্কশিক্ষাকে ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চায়।

৭. বয়স্কশিক্ষাবিদদের ভূমিকা ঃ

একবিংশ শতাব্দীর ঊষাকালে একজন বয়স্কশিক্ষাবিদের কী ভূমিকা হবে তা নির্ভর করে তিনি কোন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন তার ওপর। ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আজকের দিনে সংগঠিত হয়ে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা করা, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বিকল্প খোঁজবার চেষ্টা করা যথেষ্ট জরুরী। কোনো বয়স্কশিক্ষাবিদ তাঁর নিজের ভূমিকা সুস্পষ্ট করতে পারেন ভবিষ্যত সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ করে। ভবিষ্যত চূড়ান্ত নেতিবাচক থেকে চূড়ান্ত ইতিবাচক হতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ভবিষ্যতে চূড়ান্ত ইতিবাচক পথে পরিচালিত করে ন্যায়-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের স্বপ্নের মধ্যেই কোনো বয়স্কশিক্ষাবিদ তাঁর কাজের সার্থকতা খুঁজতে পারেন। সেজন্যে বয়স্কশিক্ষাবিদের প্রথম প্রয়োজন তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাভাষার ব্যবহার

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

মুখে সবাই স্বীকার করেন বাংলা ভাষাই পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। সকলেই একথা মানেন যে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে, সরকারি দপ্তরে কাজ চালাবার মাধ্যম হিসেবে, আদালতে বিচারের সব রকম আনুষঙ্গিক স্তরে ব্যবহারের মাধ্যম হিসেবে বাংলারই ব্যবহার হোক। কিন্তু খতিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যাবে, যে আমাদের মনের গহনে এখনও কিছু সংশয় আছে। হয়তো আমরা সত্যি সত্যিই চাই না বাংলাকে।

শিক্ষার সব স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে মেনে নিতে পেরেছি কি আমরা? প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করার বিষয়টি মোটামুটি ভাবে সবাই মেনে নিয়েছেন। একমাত্র কেন্দ্রীয় নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে শুধুমাত্র ইংরেজি ও হিন্দিরই স্থান। স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা যদি তাতে পড়াশোনা করতে চায় তাহলে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করবার অধিকারও তাদের থাকবে না। উচ্চ-মাধ্যমিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যে ছাত্র বা ছাত্রী বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করে এসেছে সে কলেজের স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে বাংলায় পড়বার মতো যথেষ্ট বই পায় না। বিশেষত বিজ্ঞান বিষয়ে। এখনও স্ট্যাটিস্টিক্স বা রাশিবিজ্ঞান, ভূ-বিদ্যা, শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি, রসায়ন, মনোবিদ্যা, বাণিজ্যবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, গণিত, কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এ সব বিষয়ে পাসকোর্স বা সাম্মানিক স্তরের উপযোগী প্রত্যেকটি বই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া যায় নি। শুধু তাই নয় স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি ছাড়া বাংলায় যেহেতু বই-ই পায় না সে জন্যে পাছে পরে অসুবিধা হয়

> পাড়ায় পাড়ায় খোলা হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। সেখানে বিশেষ পোষাক পরে ছেলেমেয়েরা আসে—তারা ইংরেজিতে নামতাও মুখস্ত করে। —ব্যাগ গুছিয়ে টিফিন বাক্স, জলের বোতল নিয়ে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করাতে তাদের বাবা-মা উৎসাহী হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। পরে দেখা যায় বাংলাদেশের সুস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ তারা হারিয়ে ফেলছে।

তাই স্নাতক স্তরেও পারুক না পারুক ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হতেই হচ্ছে।

দুশো বছর ছিলাম আমরা ইংরেজদের দ্বারা শাসিত হয়ে। স্বাধীনতা পেলাম যখন, তারপর থেকেও প্রায় ৫৯টি বছর কেটে গেল! অথচ আজও পর্যন্ত ইংরেজির দ্বারস্থ না হয়ে আমরা স্বাধীনভাবে ভাবতে পর্যন্ত পারছি না।

স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত দেশবাসী ভাবত নিজেদের বিদ্যার্জনের জন্যে নিজেদের মাতৃভাষার ব্যবহার করব। আমরা তখন গান গাইতাম—'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনা স্বদেশি ভাষা মিটে কি আশা?' আমরা বলতাম, 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা'। কিন্তু স্বাধীনতার পর কী দেখছি?

পাড়ায় পাড়ায় খোলা হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। সেখানে বিশেষ পোষাক পরে ছেলেমেয়েরা আসে--তারা ইংরেজিতে নামতাও মুখস্ত করে। — ব্যাগ গুছিয়ে টিফিন বাক্স, জলের বোতল নিয়ে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করাতে তাদের বাবা-মা উৎসাহী হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। পরে দেখা যায় বাংলাদেশের সুস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ তারা হারিয়ে ফেলছে। এই প্রবণতা উচ্চ-নিম্ন সব মধ্যবিত্তদের মধ্যে ব্যাপকভাবে রয়েছে, উচ্চবিত্তদের মধ্যে তো আছেই, এছাড়া নিম্নবর্গের মধ্যেও এ প্রবণতা ব্যাপকভাবে সংক্রামিত। সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে কে না?

> আদালতে বিশেষ করে হাইকোর্টে আসুন--জজ বাঙালি, উকিল বাঙালি, ফরিয়াদি বাঙালি, প্রতিবাদী-বাদী বাঙালি—মামলার বিষয় এ দেশীয় কিন্তু অদ্ভুত এক প্রথার অভ্যাসে সমস্ত কাজ কারবার, উকিলের বক্তব্য, বিরোধী উকিলের জবাব, জজ সাহেবের প্রশ্ন, মামলার রায় সবই ইংরেজিতে।

স্কুলে সাধারণ পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়েছে অথচ বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিতে চায়—এমন ছাত্রদের জন্যেও মাতৃভাষায় বইয়ের যোগান নেই। আই-টি-আই স্তরে নেই, জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে নেই—পলিটেকনিক স্তরে, কারিগরি শিক্ষার স্তরে বাংলায় বই নেই, ডিগ্রি বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্তরে তো নেই-ই।

এরা কি ইংরেজিতে দক্ষ? ইংরেজিতে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা ভাব বিনিময় করে এরা? তা যদি না হয় তবে ইংরেজির বোঝা এদের উপর চাপানো হয় কেন? ইংরেজির বেড়া ডিঙিয়ে শিক্ষার মূলকথাটুকু এরা নিতেই পারে না। তবু ইংরেজি বই পড়তে হবে!

কারিগরি বিদ্যা ছাড়াও যে যে বিদ্যায় মাতৃভাষার মাধ্যমে আজও পড়বার অনুমতি দেওয়া হয়নি সেগুলি কী কী সবাই জানেন কি? জেনে রাখা ভালো,

সেগুলি হল চিকিৎসাবিদ্যা, আইনবিদ্যা, ব্যবস্থাপনা বা বিজনেস্ ম্যানেজমেন্টবিদ্যা এবং কৃষিবিদ্যা।

রোগী বাঙালি, ডাক্তার বাঙালি, রোগের লক্ষণ রোগী বাংলাতেই বলছে ডাক্তারও বাংলাতেই বুঝছেন তা। কিন্তু তাঁরা দুর্বোধ্য হাতের লেখায় ইংরেজিতে প্রেসক্রিপশন লিখছেন—কেবল ওষুধের দোকানদাররাই তা পড়তে পারেন। ওষুধের নাম রাসায়নিক পদার্থের নামে নয়—ইংরেজিতে লেখা। কবার খাওয়া হবে ওষুধ খাবার আগে না পরে তাও সাংকেতিক ভাষায় বিডিপিসি/টিডিপিসি করে লেখা—ওষুধের দোকানদারেরা মানে বুঝিয়ে দিলে বুঝি। বাংলায় ডাক্তারি পড়বার অনুমতি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল এখনও দেয়নি।

আদালতে বিশেষ করে হাইকোর্টে আসুন—জজ বাঙালি, উকিল বাঙালি, ফরিয়াদি বাঙালি, প্রতিবাদী-বাদী বাঙালি—মামলার বিষয় এ দেশীয় কিন্তু অদ্ভুত এক প্রথার অভ্যাসে সমস্ত কাজ-কারবার, উকিলের বক্তব্য, বিরোধী উকিলের জবাব, জজ সাহেবের প্রশ্ন, মামলার রায় সবই ইংরেজিতে। বাংলায় আইনের বই রচিত হয়নি। যা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য মাত্র।

কৃষিবিদ্যার স্নাতক হয়ে যারা বেরিয়ে আসছে তারাও বিদ্যার বিষয় শেখে ইংরেজিতে—বিদ্যা এবং জীবনে প্রয়োগ এ দুইয়ের মধ্যে যতটা ফাঁক থাকার তা থেকেই যাবে। কৃষিবিদ্যা, পশুচিকিৎসার উচ্চতর মানের গ্রন্থ বাংলায় রচনা করার যোগ্য লোক আছেন—কিন্তু যেহেতু বাংলা মাধ্যমে এসব বিদ্যা পড়বার অনুমতি নেই তাই তাঁরা লিখছেন না।

দোকানদারি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, বাণিজ্য পরিচালনা এসব বিষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাশাস্ত্র গড়ে উঠেছে—কিন্তু দেশীয় মাধ্যমে তার প্রয়োগ ঘটছে না—।

বিপরীত পক্ষে আমরা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের চেয়েও বেশি করে ঝুঁকছি ইংরেজির দিকে—বঞ্চিত থাকল ইংরেজি-না-জানা অধিকাংশের দল আর বঞ্চিত থাকবে সদ্যসাক্ষর ও সাক্ষরোত্তর বিশাল সংখ্যক মানুষ। তোমরা ওই পর্যন্ত জানবে—আমরা আরও জানব—সুবিধে ভোগ করব—তুমি তোমার গণ্ডির মধ্যে থাকবে—আমি রাজ্য ছেড়ে বাইরে যাব, আন্তর্জাতিক বাজারে ঢুকব—আমি ইংরেজি জানি—তোমাকে টেনে তুলব না—তোমাকে চলাফেরায় আপন ভাষার সুবিধে দিলে হয়ত আমার অসুবিধে হবে — এই মনোভাবই ইংরেজি মাধ্যমকে বহাল রেখে দিচ্ছে কি?

বর্ণ-বিভ্রান্তি

সুনীল কুমার দত্ত

ভাষা বহতা নদী। এরকম কথাই চলে আসছে। কিন্তু তাই বলে বর্ণ ও বানানও যে বহতা নদী হবে তা জানতুম না। ভাষা বদলায়। তবে খুব ধীরে ধীরে; রাতারাতি নয়। ইদানীং সবই হয়।

আমি তো অত্যাধুনিক বাংলাভাষার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারিনে। গঙ্গা আর পদ্মাপারের ভাষার এক জগা-খিচুড়ি আজকের এই বাংলা। তার সঙ্গে স্বাধিকারপ্রমত্ত লেখকদের খেয়াল-খুশি। কঠোর বিশুদ্ধতার কথা ছেড়ে দিলুম কিন্তু কিছু নিয়ম-নীতি তো মানতে হবে। আর যাই হোক, মাৎস্য-ন্যায় কখনো চলতে পারে না। অথচ আজকাল "এলোমেলো করে দে মা, লুটে-পুটে খাই।"

সব চেয়ে বড়ো ভয় দেশের সরকার যখন শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আধিপত্য করতে বসে। তথাকথিত সাম্যবাদী দেশে এটা চলে কিন্তু আশংকা হয় গণতান্ত্রিক দেশে এই ছায়া যখন পড়ে। এখানেই সমস্যা। সাধারণ মানুষের তবে কে কোথায় শুনেছে সাধারণ মানুষের ভাষা আছে? তারা চুপ করেই থাকে। বিশেষ একটি গোষ্ঠীই এদের হয়ে কথা বলে। তুমি বিদ্বান হতে পার, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার হতে পার কিন্তু ঠিক কথাটি তুমি বলতে পার না। ঠিক কথাটি 'তারাই' বলতে পারে; কেন- না, পরিস্থিতি 'তারাই' বোঝে।

> বিভিন্ন কাগজ আর বিভিন্ন লেখকের হরেক রকম বানান। মরবি তো মর সাধারণ পাঠকরা আর কচি পড়ুয়ারা। বাংলা শিক্ষার্থী অবঙ্গীয়দের তো আরও শোচনীয় অবস্থা। এই রকম বিশৃঙ্খলা, বোধ হয়, একমাত্র বাংলাতেই সম্ভব।

না হলে একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন সংস্থা থাকতে আর একটি কেন? যে উদ্দেশ্যে সেটি সে উদ্দেশ্যেই তো "পরিষদ"। একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে সজীব রাখাই তো একটি জাতির প্রাণশক্তির পরিচয়। ফরাসীরা কি তাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখছে না? "ইউ-কে'র Royal Society of London (১৬৬২), Royal Academy (১৭৬৮), Royal Institution

(১৭৯৯) প্রভৃতি বাতিল করে ব্লেয়ার মন্ত্রিসভা কি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে? আসলে আমার একচ্ছত্র শাসনে আমি ছাড়া অন্য কিছু নাস্তি। আর "বুদ্ধি যাহাদের জীবিকা" আমাদের দেশে তারা দেহে এবং মনে একটু দুর্বল হয় এবং এই কর্তাভজার দেশে তারা একটু বেশিই কর্তা ভজে। আসলে বুদ্ধির বেসাতি করলে বোধকে বিসর্জন দিতে হয়। না হলে সোনাদানাটা হাতছাড়া হয়ে যায়। অতএব "পরিষদ্" ধুঁকুক কিন্তু আমাদেরটি ছুটুক। তার রথের চাকায় তুমি পিষলে না মরলে তাতে ক্ষতি কী বা কার? কিন্তু লাভ তোমার আমার। অবিশ্যি তোমাকে কাছের লোক হতে হবে।

এই কাছের লোকেরাই তো রথের ধ্বজা ধরেন বা ধরার জন্যে অপেক্ষা করেন। বাংলা ভাষার তাঁরাই তো দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। তাঁদের বিধান মানবে না এমন সাহস কোন জনার। অতএব তাঁরা যখন 'শিক্ষার্থীদের' 'সুবিধের জন্যে' বাংলা ভাষার সংস্কারের ফরমান জারি করেন, উচ্চারণ মাফিক বানান লেখার নির্দেশ দেন এবং সেই মতো পুঁথিপত্তর ছাপেন তখন কার কী করার থাকতে পারে। সেই যুগ অন্তর্হিত যখন ব্যক্তি মানুষের কথাও সোচ্চার হত, বড়ো মাপের মানুষগুলিও পাঁচ জনের কথার দাম দিত; আর যাই হোক, কোনো যূপকাষ্ঠে মাথা গলাতে হত না।

> এটা ঠিকই 'ঋ' আমরা উচ্চারণ করি না। 'র + ই' = রি (ঋ)। কিন্তু 'ৃ' (ঋ-কার) এবং ঋ-যুক্ত শব্দ সবই সংস্কৃত। বাংলা থেকে তাদের আমরা ছেঁটে ফেলতে পারি না। আজকে ঋষিরা না থাকলেও ঋষভরা ফিরে এসেছে। এটা অস্বীকার করলে অনৃত ভাষণ হবে।

এ এক অদ্ভুত দেশে আমরা বাস করি। এখানে সুস্থিতি বলে কোনো কিছু নেই। কোনো কিছুরই একটা নির্দিষ্ট রূপ থাকার উপায় নেই। আজ যদি কোনো সরকার ছড়ি ঘোরায় কাল যে কোনো সরদার ছড়ি ঘোরাবে না এমন কোনো কথা নেই। ছড়ি ঘোরানোটাই কাজ, কেরদানি দেখালেই কেরামতি। তাই এসো, ভাঙো; নিজেদের অগ্রপশ্চাৎবিহীন ভাবনাকে বৈপ্লবিক বলে রূপায়িত কর।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের সময় থেকেই বাংলা বর্ণ ও বানানের একটা নির্দিষ্ট রূপরেখা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তাতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল বলে তো মনে হয়নি। একটু আধটু অসুবিধে যা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা মিটিয়ে দিয়েছিল এবং রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁর

"চলন্তিকা"য় তাকে বাস্তবায়িত করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাতে অধুনান্তিক পণ্ডিতরা খুশি হলেন না। তাঁরা তাঁদের কেরামতি দেখাবার জন্যে একটা ধুয়া তুললেন ঃ শিশুদের এতে নাকি খুব অসুবিধে হচ্ছে; সাক্ষরতার হার না কি বাড়ছে না। অতএব বর্ণ সংস্কারের না কি খুবই প্রয়োজন। কিন্তু আখেরে তাঁরা যে ভাষাটারই সর্বনাশ করছেন সে খেয়াল তাঁদের নেই। নিজেদের আশু উদ্দেশ্য পূরণ হলেই হল। আর এই রকম মানসিকতা থেকেই শুধু তকমা-আঁটা পণ্ডিতরাই নন, খবরের কাগজওয়ালারাও খেয়াল-খুশি মতন নিজেদের বানান-বিধি তৈরি করে নেন। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম! বিভিন্ন কাগজ আর বিভিন্ন লেখকের হরেক রকম বানান। মরবি তো মর সাধারণ পাঠকরা আর কচি পড়ুয়ারা। বাংলা শিক্ষার্থী অবঙ্গীয়দের তো আরও শোচনীয় অবস্থা। এই রকম বিশৃঙ্খলা, বোধ হয়, একমাত্র বাংলাতেই সম্ভব। বিকল্প বানান গুটিকয় ক্ষেত্রে থাকে; কিন্তু এই রকম শতধা বিভিন্ন নয়।

> **যুক্তবর্ণ প্রথমে থাকলে ধ্বনিত বর্ণটি লেখা গেলেও শব্দটির সম্পূর্ণ রূপ কি পাওয়া যাবে? 'খয়' লিখলে কি 'ক্ষয়' বোঝাবে? 'সাস্থ' লিখলে কি 'স্বাস্থ্য' ভাল যাবে? সৃতি আর স্মৃতি কি এক?**

এঁদেরই প্রস্তাব ঃ বাংলা বর্ণমালাকে সহজ করতে হবে এবং সেই কার্য সাধনের জন্য বর্ণ বর্জন থেকে যুক্তবর্ণ বিভাজন পর্যন্ত করতে হবে। এঁদের ব্যক্ত এবং অভিপ্রেত অভিমত হল ঃ-

১. দীর্ঘস্বর যে হেতু অনুচ্চারিত তা রাখার কোনো সার্থকতা নেই
২. ঌ, ঐ, ঔ অনায়াসেই বর্জনীয়
৩. সমস্ত 'কার'-চিহ্নগুলি সংশ্লিষ্ট বর্ণের পরে বসাতে হবে
৪. যুক্ত বর্ণ ভেঙে পৃথক রূপ দিতে হবে
৫. যুক্ত বর্ণ প্রথমে থাকলে ধ্বনিত বর্ণটিই কেবল লিখতে হবে
৬. ঙ, ঞ, ব (অন্তঃস্থ), ৎ, য বাদ দেওয়া বিধেয়
৭. দরকারে নতুন বর্ণ তৈরি করতে হবে, যথা "অ্যা"
৮. স ও ষ বর্জনীয়
৯. হসন্ত ও বিসর্গ চিহ্নের লোপ
১০. সর্বভারতীয় ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলার পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরের প্রবর্তন।

ধরা যাক, এই প্রস্তাবগুলি মোটামুটিভাবে গৃহীত হল। তাহলে সেই বাংলা

ভাষার রূপ আমরা লিখতে পারব তো? শুধু দেখা যাক প্রস্তাব বা ভাবনাচিন্তাগুলি কত দূর গ্রহণযোগ্য বা আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না -

১. দীর্ঘস্বর উচ্চারিত না হলেও তৎসম শব্দের জন্য রক্ষণীয়। মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গেলে তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। অবিশ্যি আজকাল তৎসম-তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে ভিন্ন বানানই দেখা যায়। যেমন 'পূজা' কিন্তু 'পুজো'। 'কি' এবং 'কী' -এর গণ্ডগোল আমাদেরই সৃষ্টি। 'কি' মূলত অব্যয় এবং ইংরেজী deter-miner-এর মতন। ব্যবহার ভেদে 'ঈ' বিকল্প। চলন্তিকা-য় 'বেশী জোর দিতে' 'ঈ' বিধান দেওয়া আছে। কিন্তু 'ই' কার-ই বিধেয়। পড়ার উপরই সব কিছু নির্ভর করে।

> **সর্বশেষ প্রস্তাব কামান দাগা। হতভাগিনী বাংলা ভাষার কবর রচনা করা। দেবনাগরী অক্ষরে বাংলা লেখা। যুক্তি হল ঃ এতে ভারতীয় ঐতিহ্য বজায় থাকবে, ঐক্যবোধ সংহত হবে এবং বহুজনের কাছে বাংলা বোধগম্য হবে। যদি তাই হত তবে অহমীয়া-মনিপুরী বঙ্গবাসীর কাছে সহজবোধ্য হত, গুজরাটি-মারাঠি হিন্দুস্থানিদের কাছে। লিপির সঙ্গে ভাষার একটি অচ্ছেদ্য যোগ আছে এবং উচ্চারণও নির্ভর করে লিপির ওপর।**

তা'ছাড়া, এটা হয়ত ভাষা-বিজ্ঞানীরা জানেন যে, বাংলা উচ্চারণেও হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ - খুশ এবং খুশি। এখানে উ-কারের উচ্চারণ দ্বিবিধ;

প্রথম ক্ষেত্রে 'দীর্ঘ'; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'হ্রস্ব'। তাই বলে কি আমরা 'খূশ' লিখব? বাংলা একাক্ষর শব্দ "ই-কার" "উ-কার"-সংযোজনে দীর্ঘ হয় কিন্তু বহু স্বরবিশিষ্ট শব্দ হ্রস্ব। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান মতে ব্যাকরণ de-scriptive। কিন্তু আমাদের বৈয়াকরণরা prescriptive ব্যাকরণ নিয়েই পড়ে আছেন। যদিও মুখে তাঁরা বিপ্লব ঘটান।

২. 'ঌ' ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণকে বাদ দেওয়া নিছক বাতুলতা। 'ঋ', 'ঐ' ও 'ঔ' কখনোই বর্জনীয় নয়। এটা ঠিকই 'ঋ' আমরা উচ্চারণ করি না। 'র + ই' = রি (ঋ)। কিন্তু 'ৃ' (ঋ-কার) এবং ঋ-যুক্ত শব্দ সবই সংস্কৃত। বাংলা থেকে তাদের আমরা ছেঁটে ফেলতে পারি না। আজকে ঋষিরা না থাকলেও ঋষভরা ফিরে এসেছে। এটা অস্বীকার করলে অনৃত ভাষণ হবে।

ঐ এবং ঔ Dipthong বা যুক্তস্বর। বর্ণ দুটি অ/ও + ই এবং অ/ও + উ - এই ভাবেও লেখা যেতে পারে। কিন্তু এদের 'কার' - চিহ্নের বেলা কী হবে? 'ৈ' এবং 'ৌ' বাদ দিয়ে "তৈল" মর্দনও হবে না, "রৌপ্য"ও মিলবে না।

৩. বাংলায় 'কার'-চিহ্নগুলির সংস্থান বড়ো বিচিত্র। কোনোটি বর্ণের ডান দিকে, কোনোটি বাঁ দিকে, কোনোটি ঊর্ধ্বে, কোনোটি 'অধে' (নিচে)। এই চিহ্নগুলিকে একই দিকে আনা মানে নূতন 'কার'-চিহ্নের উদ্ভাবন অথবা প্রচলিত চিহ্নের সংস্কার। এর কোনোটিই কি আদৌ সম্ভব? বাংলা বর্ণের আদিকাল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। চালর্স উইলকিন্স্ এই আদলেই বাংলা বর্ণের রূপ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলা মুদ্রণশিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি হলেও এই প্রণালীর পরিবর্তনের উদ্ভট চিন্তা কারো মাথায় আসেনি। দশম শতক থেকেই আমরা যদি এই পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া করে আসতে পারি তাহলে আজই বা পারব না কেন! বর্ণের উপর বলাৎকার করা থেকে এই পণ্ডিতরা যদি বিরত থাকেন তাহলে আমাদের দুঃখিনী ভাষা জননী বেঁচে যায়।

> আমাদের বাঙালিদের কোন ঐতিহ্য নেই। কোন ধারাবাহিক দেশীয় শাসন কর্তৃত্ব নেই। 'জাতি' **(Nation)** হিসেবেও আমরা প্রতিষ্ঠিত নই। নৃপতিতিলক হুসেন-শাহর পর কোনো প্রশাসন কর্তৃপক্ষই বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষণা করেন নি।

৪. যুক্তবর্ণের লোপ এবং বর্ণবিভাজন এবং পরপর বর্ণযোজনায় শব্দ গঠন বাংলায় কেন, কোন ভারতীয় ভাষাতেই সম্ভব নয়। দু-পাঁচটি ক্ষেত্র ছেড়ে দিলেও এর সর্বজনীন রূপ একেবারেই অসম্ভব। বাংলা বর্ণের চরিত্রের দরুন এটা সম্ভব নয়। 'জ্ঞান' কি এইভাবে লেখা যাবে - জ + ঞ + আ + ন = "জঞআন" অথবা "ব্রহ্মা" - ব + র + হ + ম + আ = "বরহ্ম্আ"? তেমনিই সম্ভব নয় সমস্ত 'ফলা' জাতীয় শব্দ, যেমন য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা লোপ করা, এবং এই যুক্তবর্ণগুলি - যথা স্ন (স্নান), শ্ম (শ্মশান), ক্ষ (ক + ষ), ঞ্চ (ঞ + চ), ঞ্জ (ঞ + জ), ঞ্ছ (ঞ + ছ), ত্থ (ত + থ), ন্থ (ন + থ), স্থ (স + থ), স্ফ (স + ফ), স্ক (স + ক) ইত্যাদি, বিযুক্ত ভাবে লেখা। হসন্ত প্রয়োগে-ও এর সার্বিক সমাধান কখনোই সম্ভব নয়। ইংরেজি আর বাংলা বর্ণের চরিত্র মূলত আলাদা। তাই লিখতে গিয়ে

অনায়াসেই CHRIST লেখা যায় কিন্তু বাংলায় লিখলে "ক/খ + রআই্স্ট" হাস্যকর ব্যাপার।

৫. যুক্তবর্ণ প্রথমে থাকলে ধ্বনিত বর্ণটি লেখা গেলেও শব্দটির সম্পূর্ণ রূপ কি পাওয়া যাবে? 'খয়' লিখলে কি 'ক্ষয়' বোঝাবে? 'সাস্থ' লিখলে কি 'স্বাস্থ্য' ভালো যাবে? সৃতি আর স্মৃতি কি এক?

৬. ঙ, ঞ, ব (অন্তঃস্থ), য় ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বাদ দেওয়া নিছকই বাতুলতা। বর্ণগুলি দিয়ে শব্দ সুরু হয় না ঠিকই কিন্তু শব্দ গঠনে অপরিহার্য। আমরা 'বাঙালি' থাকব, না 'বাংগালি' হব? যে ভাবে বর্তমান পণ্ডিতরা এগোচ্ছেন তাতে করে বাঙালিত্ব বেশি দিন থাকবে বলে মনে হয় না। 'নয় ছয়' থুড়ি 'নয' তথা 'নজ' এবং 'ছয' তথা 'ছজ' না হয়ে যায় না।

৭. আমরা একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি (অ্যা) যেটি বাংলায় য-ফলা ও আকার দিয়ে লেখা হয়। এই ধ্বনিটি লেখার জন্য সাধারণত 'অ্যা' বা 'এ্যা' চিহ্ন আমরা ব্যবহার করি। তাই বলে কোনো বর্ণ বা অক্ষর তৈরি করা বা "তৎরূপ" উচ্চারণ হলেই "্যা" ব্যবহার করা মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়। আমার এই লেখাটা 'যেমন তেমন' হতে পারে তবে 'য্যামনত্যামন' বা 'জ্যামোন ত্যামোন' করার খ্যাপামি আমার নেই।

৮. এটা মানতে হবে যে, বাংলায় শ ষ স যথাযথ উচ্চারিত হয় না। বাংলায় মূলত 'শ'-ই ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত যুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রেই 'স' উচ্চারিত হয়। 'স' যদি বা উচ্চারিত হয়, 'ষ' কখনোই নয়। তাই বলে কি বর্ণগুলিকে খারিজ করে দেওয়া হবে? "শব শব্দ শমান" (সব শব্দ সমান) করা কি সুস্থতার লক্ষণ?

৯. বিসর্গ (ঃ)কেই বা কী করে বাদ দেওয়া যাবে? যাঁরা এই সব বাতুল প্রস্তাব করেন বা জোর করে ঈদৃশ বানান আরোপ করেন, তাঁরা প্রকারান্তরে বাংলা ভাষারই ক্ষতি সাধন করেন। তারা 'দুক্খিত' হন না, আমরা দুঃখিত হই। তাঁদের 'দুঃশাসন' থেকে কারা যে বাংলা ভাষাকে বাঁচাবে জানি না। বাংলা থেকে তৎসম শব্দ কি বাদ দেওয়া যেতে পারে বা সমস্ত তৎসম শব্দকে বাংলায়িত করা? সে দিনের কথা ভাবলেও আতঙ্কিত হতে হয়। ল্যাটিন-গ্রিক-স্ক্যানডিনেভিয়ান ছাড়া ইংরেজরাও কি ইংরেজি ভাষা ভাবতে পারে?

১০. এবং সর্বশেষ প্রস্তাব কামান দাগা। হতভাগিনী বাংলা ভাষার কবর রচনা

করা। দেবনাগরী অক্ষরে বাংলা লেখা। যুক্তি হল ঃ এতে ভারতীয় ঐতিহ্য বজায় থাকবে, ঐক্যবোধ সংহত হবে এবং বহুজনের কাছে বাংলা বোধগম্য হবে। যদি তাই হত তবে অহমীয়া-মনিপুরী বঙ্গবাসীর কাছে সহজবোধ্য হত, গুজরাটি-মারাঠি হিন্দুস্থানিদের কাছে। লিপির সঙ্গে ভাষার একটি অচ্ছেদ্য যোগ আছে এবং উচ্চারণও নির্ভর করে লিপির ওপর। সহস্র বছরের ব্যবহারে বাংলা ভাষার যে রূপটি দাঁড়িয়েছে, অন্য লিপির ব্যবহারে তার প্রকাশ রুদ্ধ এবং পরিবর্তিত হতে বাধ্য। 'পরীক্ষা' শব্দটি বাংলায় 'পোরিক্‌খা' কিন্তু হিন্দিতে "পারি্‌ক্‌ষা"। দেবনাগরী অক্ষরে বাংলা একটি বিজাতীয় ভাষা হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যেই আমরা "অন্ত্যাক্ষরী" (অন্ত্য + অক্ষরী)-কে "আনতাকসারী" বলতে সুরু করেছি। "অন্ত্যাক্ষরী" প্রায় সবার কাছেই অন্তেবাসী। এরপর যদি দেবনাগরী অক্ষরে বাংলা লেখা হয় তবে ষোলো কলা পূর্ণ হয়। ভারতীয় সংহতির হদ্দমুদ্দ হয়।

স্বভাবতই আমাকে প্রাচীনপন্থী ও পরিবর্তন-বিরোধী আখ্যা দেওয়া যাবে। কিন্তু কথা হল পরিবর্তন করলেই প্রগতিপন্থী হওয়া যায় না। স্বীকার করি ভাষা বহতা নদী। নদীর মতোই পবিবর্তনশীল। কিন্তু তা হলেও নদীর একটা মূল গতি থাকে। ভাষারও তা থাকে। সেই গতি কথঞ্চিৎ স্থিতিশীল। কিন্তু আমরা, বাঙালিরা, মনে হয়, খুব চপলমতি। পলিমাটির দেশের কোনো কিছুই দানা বাঁধে না। আর Discipline কথাটি বাংলা ভাষাতে কেন, ভারতের তাবৎ ভাষাতেই নেই। বাংলা দেশে কোনো রাজবংশের রাজপ্রাসাদ বা রাজধানীর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষারও একটি নির্দিষ্ট রূপ আমরা পাই না। এলোমেলো করে দেওয়াটাই আমাদের ধর্ম। এবং সেটাই আজ খুব বেশি প্রকট। আর একটা ব্যাপার বাঙালিদের খুব প্রিয়। সস্তায় কিস্তিমাৎ করা, নাম জাহির করা। আখেরে কী হবে অত ভেবে লাভ কী!

সাহিত্য পরিষদ অসহায়। অভ্রংলিহ ব্যক্তিত্ব আজ দুর্লভ। সুলভ আজ বালখিল্যগণ। আমরা কোথায় যাব? Quo Vadis!

যে যাই বলুক, পৃথিবীতে ইংরেজরা একটি বিশিষ্ট জাতি। দেড় হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমউন্নতিশীল সভ্যতার বনিয়াদ তারা গড়ে তুলেছে। কোনো কিছু তারা ভাঙেনি, নষ্ট করেনি; বরং শ্রীমণ্ডিত করে সব কিছু রক্ষা করেছে। ভাষার ব্যাপারেও তারা যুক্তিপূর্ণভাবে পরিবর্তনশীল। সমস্ত

ঐতিহ্যকে তারা রক্ষা করে চলেছে। 'F' দিয়ে 'Ph'-এর কাজ চললেও তারা তা করেনি। Photo-কে তারা "Foto" লেখেনি। শব্দের মূলকে তারা নস্যাৎ করেনি।

আমাদের বাঙালিদের কোনো ঐতিহ্য নেই। কোন ধারাবাহিক দেশীয় শাসন কর্তৃত্ব নেই। 'জাতি' (Nation) হিসেবেও আমরা প্রতিষ্ঠিত নই। নৃপতিতিলক হুসেন-শাহর পর কোনো প্রশাসন কর্তৃপক্ষই বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষণা করেন নি। আমাদের যা হয়েছে তা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো অভ্রংলিহ প্রতিভা আজ দুর্লভ। আজ বামনদের লাফালাফি। যে বামন যত কেরদানি দেখাতে পারবে তার তত জয়জয়কার। দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়টিও আজ ঠুঁটো জগন্নাথ। আমরা ভেবেছিলুম আমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়টি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু সে আশা এতদিনেও যখন পূরণ হল না, আর কোনো দিন হবে বলেও মনে হয় না। বিশ্বভারতী-র কাছেও আমাদের ব্যর্থ নমস্কার। সাহিত্য পরিষদ অসহায়। অভ্রংলিহ ব্যক্তিত্ব আজ দুর্লভ। সুলভ আজ বালখিল্যগণ। আমরা কোথায় যাব? Quo Vadis!

বাড়ির ঝি

প্রবীর দে

ছি! ছি! ছি! হচ্ছে এসব কী?
আয়েষা, বিদিশা, হলো বাড়ির ঝি!
লেখাপড়া শিখে, ওদের হবে কী?
শিখলে পরে চাইবে ওরা বাড়তি কাজের ফি,
খাবার পাতে চাইবে খেতে ঘি।
ইচ্ছে করে জোরসে করে কানটা মলে দি,
কথাগুলো বলছে, বাড়ির বড়ো ঠাকুর ঝি।

মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস

পাওলো ফ্রেইরি

[*অনুবাদ :* পাহাড়ী চৌধুরী]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব

দক্ষিণপন্থায় স্ববিরোধের যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার বৈপরীত্যের মূর্ত প্রতিরূপ হল বিপ্লবী দলগুলি। একথা উল্লেখের অবকাশ রাখে না, বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টার মধ্যে এই স্ববিরোধের জন্ম। তাই এর বহিঃপ্রকাশের চরিত্রও একই রকম স্ববিরোধী। একথাটা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে। দক্ষিণপন্থী এবং বিপ্লবী দলগুলির পর্যানুশীলন (Praxis)-এর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকে। উভয়পক্ষই জনগণের কাছে নিজেদের কথা বলে। নিজেদের উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করে। তফাৎ হল এটাই, যে বিপ্লবীদের চরিত্র হল আদর্শবাদী। আর দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে আদৌ আদর্শবাদী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এটা কোনো আজগুবি ধারণা নয়। বিপ্লবী এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলির উদ্দেশ্য এবং কর্মধারায় যে মৌলিক পার্থক্য, তা বোঝার জন্যে এই একটি মাপকাঠিই যথেষ্ট।[২২]

প্রকৃত আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে সোচ্চারে বর্তমানের অন্যায় ব্যবস্থার ব্যাপক প্রতিবাদ করতে হবে। এবং আগাম পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে। এক্ষেত্রে, বিপ্লবী নেতারা :

১) বাস্তব অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি না করে তার ব্যাপক প্রতিবাদ করতে পারেন না।

২) আগাম পরিকল্পনা না করে পরিবর্তিত কোনো নতুন ব্যবস্থার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারেন না। এই আগাম পরিকল্পনা গড়ে ওঠে বর্তমান ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। এবং তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে শুধুমাত্র পর্যানুশীলন (Praxis)-এর মাধ্যমে।

---

[২২]আমূল সংস্কার এবং বিপরীতে দলবাজি সম্বন্ধে আমার লেখা Pedagogy of the Oppressed (নিপীড়িতের শিক্ষাবিজ্ঞান) দেখুন।

৩) মানুষের ওপরে আস্থা না রাখলে বাস্তবকে উপলব্ধি করতে পারেন না। অবস্থাটা বুঝে নিতে তাঁদের বস্তুগত তথ্যের ওপরেও নির্ভর করতে হয়।
৪) যুক্তি না দেখিয়ে মনগড়া কোনো সমালোচনা বা ঘোষণা করতে পারেন না।
৫) শুধুই বর্তমানের সমালোচনা করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো নতুন গালগল্প শোনাতে পারেন না। ভাবাবেগের আতিশয্যে অভিভূত না হয়ে বাস্তব অবস্থার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তাঁদের মতাদর্শগতভাবে বর্তমানের সমালোচনা করতে হয়। মতাদর্শগত বৈপরীত্যের ভিত্তিতে আগামী দিনের পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করতে হয়।
৬) জনগণের সঙ্গে ভাববিনিময় কোনো অবস্থায়ই বন্ধ করতে পারেন না। শুধুমাত্র বর্তমানের সমালোচনা এবং আগামী দিনে পরিবর্তনের ঘোষণার দ্বন্দ্বের মধ্যেই এই ভাববিনিময় সীমাবদ্ধ থাকে না। সম্ভাব্য পরিকল্পনাকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রেও এর অবদান থাকে। অবদান থাকে সেই পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রেও।

এইভাবেই বিপ্লবী নেতৃত্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। ফলে লক্ষ্যের ক্ষেত্রে তাদের সমঝোতার পথে যেতে হয়। ইতিহাসকে তারা ভাগ্য বলে মেনে নেবার তত্ত্বে নির্ভর করতে শুরু করে। এই নেতৃত্ব তখন মানুষকে যান্ত্রিকভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলতে চায়। যে ভবিষ্যতের স্বরূপ সম্বন্ধে নেতৃত্ব পুরোপুরি ওয়াকিবহাল কিন্তু নেতৃত্ব মনে করে যে জনগণের তা বোঝবার ক্ষমতা নেই। এক্ষেত্রে বিপ্লবী নেতৃত্ব তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। শেষ অবধি দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তাদের আর কোনো তফাৎ থাকে না। দক্ষিণপন্থীরা বর্তমান অবস্থার কোনো প্রতিবাদ করে না বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো ঘোষণা করে না। তারা শুধু বর্তমান অবস্থার যারা প্রতিবাদ করে তাদের অস্বীকার করে। আর নিজেদের সম্বন্ধে গালগল্প ছড়িয়ে বেড়ায়।

অন্যদিকে, প্রকৃত বিপ্লবী পরিকল্পনায় স্বাভাবিকভাবেই একটা আদর্শগত মাত্রা থাকে। এটা হল এমনই একটা প্রক্রিয়া যাতে জনগণের ভূমিকাই প্রধান। দুনিয়াটাকে বদলে দিয়ে নতুন এক দুনিয়া গড়ে তোলার গুরুতর দুঃসাহসিক অভিযানে কর্তৃত্বের লাগাম থাকে তাদের হাতেই। দক্ষিণপন্থীরা অবধারিতভাবেই এর বিরোধিতা করে। এই পরিকল্পনাকে তারা স্তব্ধ করে দিতে চায়। তাই এরিক ফ্রোমের ভাষায়, বিপ্লবীদের আকাঙ্খা দুকূল বজায়

রেখে চলতে চায় আর দক্ষিণপন্থীরা মৃতকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে। বিপ্লবী নেতৃত্ব যখন আমলাতান্ত্রিক হয়ে ওঠে তখন তাদেরও ওই একই অবস্থা হয়।[২৩]

বিপ্লবীদের আকাঙ্খিত আদর্শ রাষ্ট্র স্থাবরত্ব চায় না, গতিশীল হয়ে উঠতে চায়; মরণের দিকে নয়, জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়; বর্তমানের পুনরাবৃত্তি চায় না, মানুষের সৃজনশীলতা দিয়ে ভবিষ্যৎকে বদলে দিতে চায়; জান্তব অধিকারবোধ চায় না, বন্ধনমুক্তিকে ভালোবাসতে চায়; অধীনস্থ যুথবদ্ধতা চায় না, স্বাধীনভাবে একত্রে বসবাস চায়; নীরব আনুগত্য চায় না, সকলের মতামত প্রকাশের অধিকার চায়; অনড় আইনে শৃঙ্খলার স্থিতাবস্থা চায় না, পর্যানুশীলন (Praxis)-এর মাধ্যমে ক্রমোন্নয়ন চায়; নির্বিচারে সমর্থনকারী সংঘবদ্ধ মানুষ চায় না, নিজেদের ভাবনাচিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে চিন্তাশীল মানুষের সংঘবদ্ধতা চায়; নির্ধারিত কিছু বাঁধাবুলি না আওড়ে, সৃজনশীল ভাষায় ভাব বিনিময় চায়; চাটুকারিতার বদলে সুচিন্তিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায়; চাপিয়ে দেওয়া গালগল্পের বদলে, জীবনের চিরাচরিত মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিতে চায়। দক্ষিণপন্থীরা কট্টরভাবে পছন্দ করে জীবিতের চেয়ে মৃতকে; গতিশীলতার চেয়ে নিশ্চলতাকে; ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার সৃজনশীল প্রয়াসের চেয়ে ভবিষ্যতে অতীতের পুনরাবৃত্তিকে; প্রকৃত ভালোবাসার চেয়ে বিকারগ্রস্ত ভালোবাসাকে; জীবনের উত্তেজনার চেয়ে নিরুত্তাপ পরিকল্পনা করাকে; সমমর্যাদায় সহাবস্থানের চেয়ে অধীনস্থ যূথবদ্ধতাকে; সংগঠকদের চেয়ে সংগঠিত দলকে; জাগ্রত মূল্যবোধের চেয়ে চাপিয়ে দেওয়া গালগল্পকে; সৃজনশীল, ভাববিনিময়কারী ভাষার চেয়ে নির্দেশকে এবং প্রশ্ন তোলার চেয়ে বাঁধাবুলি কপচানোকে।

দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বিপ্লবীদের আমূল পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যই হল তাদের বিশেষত্ব। এই পার্থক্যের জন্যেই তারা দক্ষিণপন্থীদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত হয়। এই মৌলিক পার্থক্যের দিকেই বিপ্লবীদের ক্রমশ আরো বেশি করে নজর দিতে হবে। শুধু দক্ষিণপন্থীদের হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ, অভিজাতসুলভ ভাবভঙ্গি বা তাদের রূপকথার গল্পের নিন্দে করলেই হবে না। বিপ্লবীদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা মানুষকে শ্রদ্ধা করে। মানুষকে

---

[২৩]এ বিষয়ে ফ্রোমের The Heart of Man (মানুষের হৃদয়) বইটি দেখুন।

বিশ্বাস করে, মানুষের প্রতি আস্থা রাখে। এটা কোনো আপৎকালীন কৌশলমাত্র নয়। বিপ্লবী হওয়ার এটাই হল মূল শর্ত। এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। মানুষের প্রতি তাদের এই দায়বদ্ধতা সব সময়েই প্রযোজ্য। কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের পরে যখন একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তখন এই দায়বদ্ধতা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

অভ্যুত্থানে মানুষ হিংসার শিকার হয়। ফলে নীরবতার সংস্কৃতি আবার ফিরে আসে। একথা আমরা আগেই বলেছি। পরাধীন জীব হিসেবে, সমাজের অংশ হিসেবে, মানুষ তখন তার অভিজ্ঞতার সীমানায় দাঁড়িয়ে দিক্‌চিহ্ন খুঁজে বেড়ায়। যে দিক্‌চিহ্ন বা সংকেত তাদের বুঝিয়ে দেবে, কারা তার পক্ষে রয়েছে আর কারা বিপক্ষে। পরিকাঠামোর সঙ্গে দ্বন্দ্বে মানুষ যে পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনাই এই সংকেতের স্বাক্ষর বহন করে। উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, রীতি এবং কলাকৌশলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে একেকটি পরিকল্পনা। বিপ্লবী পরিকল্পনা যে শুধু তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের দিক থেকেই দক্ষিণপন্থী পরিকল্পনা থেকে আলাদা তা নয়, তাকে চেনা যায় তার সামগ্রিক বাস্তবতা দিয়ে। কোনো পরিকল্পনার পদ্ধতিকে তার বিষয় এবং উদ্দেশ্য থেকে আলাদা করে বিচার করা যায় না। কারণ, পদ্ধতি কখনোই এমন বিষয় নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয় যাতে সেটি মুক্তিকামী বা আধিপত্যকামী দুধরনের পরিকল্পনাতেই সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এমন পদ্ধতি শুধুমাত্র নির্বোধের অবাস্তব কল্পনাবিলাসেরই প্রকাশ মাত্র। যে কল্পনাবিলাস শুধু অলীক বাসনার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিপ্লবী পরিকল্পনা দমনপীড়নমূলক এবং মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। মানুষের কাছে এরা যে সমর্থন চায়, তা হল এই, যে মানুষ তাদের নিজেদের মুক্ত করতে সচেষ্ট হোক। উৎপীড়কদের পদ্ধতির প্রতি অন্যমনস্কভাবে মুহূর্তের দুর্বলতাও বিপ্লবী পরিকল্পনার পক্ষে বিপদজনক ও ভয়াবহ। বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে নিশ্ছিদ্র সংহতি চাই। সব মানুষের মতোই বিপ্লবীরাও কখনো বা ভুল করতে পারে। বাক্‌চাতুরি করতে পারে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো আচরণ করে তারা কখনোই নিজেদের বিপ্লবী বলে দাবি করতে পারে না। ঐতিহাসিক অবস্থানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিপ্লবীদের কাজ করতে হবে। বর্তমানে যে সব অনবদ্য বাস্তব সুযোগ রয়েছে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের ভূমিকা হল

সাহায্যকারীর। মানুষকে আধা-নিষ্ক্রিয় বা অবুঝ সচেতনতার স্তর থেকে চিন্তাশীল সচেতনতার স্তরে উন্নীত করতে হবে। এ কাজে মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে তাদের শ্রেষ্ঠ ফলপ্রসূ এবং বাস্তবোপযোগী উপায় খুঁজে বার করতে হবে। একমাত্র এই চিন্তাই হল প্রকৃত মুক্তিকামী চিন্তা। বিপ্লবী পরিকল্পনায় আগাগোড়া এর ছাপ থাকবে। আসলে প্রতিটি বিপ্লবী পরিকল্পনাই হল এমন এক সাংস্কৃতিক তৎপরতা যা ক্রমশ সাংস্কৃতিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে। এর সূত্রপাত ঘটে নেতা এবং কর্মী উভয়ের পর্যানুশীলন (Praxis)-এ।

বিপ্লব হল একটা জটিল প্রক্রিয়া। এর একটা বিজ্ঞান আছে। সেই বিজ্ঞানকে না জানলে এবং এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করলে বিপ্লবের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। যে পৃথিবীটাকে বদলে দিতে হবে, তার সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতেই মানুষ উপলব্ধি করে যে পৃথিবীটা সত্যিই বদলে যাচ্ছে। একদিকে মানুষ, অন্যদিকে বিপ্লবী নেতৃত্ব। দুই-এর মধ্যে কথাবার্তার মাধ্যম হল এই পরিবর্তনশীল পৃথিবী। যদি বাস্তব পরিস্থিতি সব সময়ে এই কথাবার্তার পক্ষে অনুকূল না হয়, তবে নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এর অস্তিত্ব যাচাই করা যেতে পারে।

বিপ্লবী নেতৃত্বকে সব সময়েই মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হবে। এর উদাহরণ রেখে গেছেন চে গুয়েভারা। তাঁর কাজকর্মের বিষয়ে আমরা যতই গভীরে যাই ততই তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসকে উপলব্ধি করি, যে সত্যিকারের বিপ্লবী হয়ে উঠতে হলে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেই হবে। মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা না থাকলে যে প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে ওঠা যায় না, একথা স্বীকার করতে গুয়েভারার এতটুকু দ্বিধা ছিল না। কৃষকরা গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয় নি। একথা তিনি বারবার লিখে গেছেন। কিন্তু 'বলিভিয়ার ডায়েরি'-তে তাদের কথা বলতে গিয়ে, কখনোই তিনি তাদের সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেন নি। শেষ অবধি তাদের যুক্ত করার আশা তিনি কখনোই ছেড়ে দেন নি। এই ভাববিনিময়ের মানসিকতা থেকেই, গুয়েভারার গেরিলা-শিবির তত্ত্বের পটভূমি হয়ে উঠেছিল। সেখানে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা মিলে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন এবং তার ভিত্তিতে তাঁদের কাজের কৌশল কী হবে তার পরিকল্পনা করতেন।

গুয়েভারা তাঁর পরিকল্পনায় পদ্ধতি, বিষয়বস্তু এবং লক্ষ্যকে বিচ্ছিন্নভাবে

দেখতেন না। নিজের এবং সঙ্গীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি গেরিলাযুদ্ধকে সমর্থন করতেন। তিনি মনে করতেন, গেরিলাযুদ্ধ হল স্বাধীনতার উপক্রমণিকা। জীবন্মৃতের কাছে জীবনের আহ্বান। ক্যামিলো টোরেসের মতো তিনি হতাশায় গেরিলা হন নি। তিনি গেরিলা হয়েছিলেন মানুষকে ভালোবেসে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, মুক্তির অভিজ্ঞতা নতুন মানুষের জন্ম দেবে। এদিক থেকে ভাবলে, তিনি প্রকৃত বিপ্লবী স্বপ্নকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। খুব কম লোকই একাজে সফল হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের মূক জনগণের কাছে তিনি ছিলেন পরিত্রাতা। এদের অনেকের সম্বন্ধেই তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। এদের সকলের হয়েই তিনি কথা বলতেন।

আমরা গুয়েভারা এবং গেরিলা হিসেবে তাঁর কাজের ধারার কথা বলেছি। তার মানে এই নয়, যে অন্যত্রও বিপ্লবীদের আমরা এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি করতে বলছি। আমরা যা বলতে চাই তা হল এই, যে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্যে বিপ্লবীদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। গুয়েভারা এটাই করেছিলেন। ধৈর্য ধরে এই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এতে যেন কোনো ছেদ না পড়ে। এই নিবন্ধে ব্যবহৃত অর্থে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন যাদের চোখে, শুধু তাদের পক্ষেই আমজনতার সঙ্গে এই যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব। মুক্তিকামী সাংস্কৃতিক তৎপরতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল আমজনতার সঙ্গে এই যোগাযোগ। প্রকৃত যোগাযোগ গড়ে উঠলে মানুষ নিজেদের মধ্যে পৃথিবী সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবেই। এই যোগাযোগের প্রেক্ষিতে পর্যানুশীলনই চেতনায়ন (conscientization) কে বাস্তবে সম্ভব করে তুলতে পারে। আসলে চেতনায়ন হল একটা যৌথ ব্যাপার। একই কাজ করে, এই কাজ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে একই ভাবে চিন্তা করে, এমন একদল মানুষের মধ্যে একজনের চেতনায়ন সবার মধ্যেই উপলব্ধির স্বচ্ছতা এনে দেয়। গোল্ডম্যান একেই বলেছেন, বিকশিত সচেতনতার সীমানার ঊর্ধ্বে বহুলাংশে প্রচ্ছন্ন সচেতনতা।

(চলবে)

হুগলি জেলার ইলছোবা-দাসপুর মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্র — সাফল্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত

কাজল চক্রবর্তী

প্রবহমান শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে ক্রমেই বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে হুগলি জেলা। প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়নের সময় থেকেই জেলাতে সব রকম উদ্যোগ চালিত হচ্ছে জন-অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সম্ভবত এটিই একমাত্র জেলা, যেখানে জেলার প্রবহমান শিক্ষার প্রকল্পটি বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে সকলের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই জেলায় কেবল জেলা-স্তরে নয়, সর্বস্তরের অনুপ্রেরকদের প্রশিক্ষণ শিবিরও ছিল আবাসিক। এতে কর্মীদের মধ্যে যেমন ধারণার স্বচ্ছতা বেড়েছে, তেমনি সহকর্মীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সহমর্মিতা বোধ। জনশিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে কেবল সাক্ষরতার কাজে সীমিত না রেখে এগুলিকে জনশিক্ষা, সংস্কৃতি ও সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালনা করার জন্যে সদা সক্রিয় জেলার সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদ। প্রবীণ স্বাধীনতা যোদ্ধা ও জননেতা শ্রী বিনোদ দাশের মতো প্রবীণ ও ব্যস্ত মানুষও জেলার প্রায় প্রতিটি পর্ষদ-সভাতে উপস্থিত থেকে যেভাবে আমাদের কাজের পর্যালোচনা করেন, তাতে আমরা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হই। জেলাতে মোট জনশিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৯৫৯টি, মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২১৮টি। বর্তমানে জেলাটি দ্বিতীয় আর্থিক বর্ষের প্রথম অংশের কাজ রূপায়ণ করছে। প্রথম আর্থিক বছরের শেষে

> - আমাদের দেশে গণ-সাক্ষরতার এক ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হয় ১৯৯০ সাল থেকে। এখন তা উন্নীত হয়েছে জনশিক্ষা আন্দোলনে। নানা সাফল্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা মিলিয়েই এই আন্দোলন। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদ-মাধ্যমে এই আন্দোলনের বাস্তব বা কল্পিত ত্রুটিগুলিকেই তুলে ধরা হয়। সাফল্যের দিকগুলিকে তুলে ধরা হয় না। আমরা পত্রিকার এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে চাই। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাস্তবনিষ্ঠ সচিত্র প্রতিবেদন পাঠাতে অনুরোধ করছি।
>
> —সম্পাদক মণ্ডলী

লেখক একজন নিষ্ঠাবান তরুণ সাক্ষরতা কর্মী এবং বর্তমানে হুগলি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পর্ষদের জেলা সমন্বয়কারী।

রাজ্য সাক্ষরতা মিশনের সহায়তায় জেলাতে যে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হয়, তার ফলাফলকে ভিত্তি করেই আমরা আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করেছি।

হুগলি জেলায় ব্লকের সংখ্যা ১৮টি এবং পৌরসভা ১২টি। জেলার জনঘনত্ব খুবই বেশি। ২০০১ সালের জনগণনার চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুসারে জেলায় সাক্ষরতার হার নিম্নরূপ (রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ স্থানে) :—

গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল			মোট		
মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
৭১.০	৭৯.৭	৬২.১	৮২.৯	৮৭.৮	৭৭.৫	৭৫.১	৮২.৬	৬৭.২

জেলার ব্লকগুলির মধ্যে অনেকটা পশ্চাৎপট হল পাণ্ডুয়া ব্লক। এখানকার সাক্ষরতার মোট হার হল ৬৮.০২%। পুরুষদের মধ্যে ৭৬.৬৯% এবং নারীদের মধ্যে ৫১.২৬%। এই ব্লকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েত হল ইলছোবা-দাসপুর। এখানকার মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রটির নাম 'শরৎচন্দ্র মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্র'। এই কেন্দ্রটি বর্তমানে জেলার মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারাবাহিক কর্মধারার মাধ্যমে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। খুবই সংক্ষিপ্তভাবে এই কেন্দ্রের কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হল।



হুগলী জেলা পরিষদের তৎকালীন সভাধিপতি শ্রী শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাক্ষরতা সমিতির সচিব শ্রী এ. বি. বর্ধন, শিক্ষাবিদ ড. শুভংকর চক্রবর্তী ও ড. নির্মল দাশ সাক্ষরোত্তর ও প্রবহমান কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

শুরুতেই এলাকার কিছুটা পরিচয় দেওয়া থাকে।

ইলছোবা-দাসপুর : গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক তথ্য

১. আয়তন :	১২ বর্গকিমি
২. লোকসংখ্যা :	১৫০২৩ (পুরুষ ৭৫১৬; মহিলা - ৭৫০৭)
৩. মৌজা :	১৩টি (আই.টি.ডি.পি মৌজা - ৪টি)
৪. গ্রাম :	১৪টি; বুথ ১২টি
৫. পরিবার সংখ্যা :	৩৪৭৮টি
৬. প্রাথমিক বিদ্যালয় :	১২টি
৭. জুনিয়র হাইস্কুল :	১টি (এই বৎসর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদন পেয়েছে)
৮. গ্রন্থাগার :	সরকারি ২টি + ১টি বেসরকারি
৯. অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র :	২০টি
১০. জনশিক্ষা কেন্দ্র :	৮টি + ১টি (মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্র)
১১. ডাকঘর :	১টি
১২. ক্লাব :	৩টি
১৩. শিশু শিক্ষাকেন্দ্র :	১টি
১৪. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র :	২টি + ১টি
১৫. পশু চিকিৎসালয় :	১টি
১৬. খোঁয়াড় :	৬টি
১৭. নদী সেচ প্রকল্প :	৩টি
১৮. মিনিডিপ :	১৫০টি
১৯. সমবায় সমিতি :	২টি
২০. রেশন দোকান :	৪টি
২১. নলকূপ :	৭টি (গভীর)
২২. অগভীর নলকূপ :	৯টি
২৩. ক্ষেতমজুর ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের সংখ্যা :	১৩৫টি

মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঃ

প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রতিটি জনশিক্ষা কেন্দ্রের জন্যে বহুমুখী কাজগুলি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। স্বল্প সাক্ষরদের পাঠ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি এই 'শরৎচন্দ্র মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্র'টি অন্যান্য বহুমুখী কাজগুলি করছে। গ্রন্থাগারের পাঠক কেন্দ্রে এসে যেমন পড়েন তেমনি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারও চালু করা হয়েছে। এতে পাঠকেন্দ্রে পড়তে আসা ব্যক্তিরা যেমন আগ্রহ প্রকাশ করছেন তেমনি স্থানীয় মানুষজনও বিপুল সাড়া দিয়েছেন। বর্তমানে এই মুখ্য কেন্দ্রের সভ্য সংখ্যা ১৭৬ জন। এছাড়া তাঁরা নতুন নতুন বই চাইছেন। ছোটো ছোটো সকল পড়ুয়াদেরও এই বইগুলি বেশ ভালো লেগেছে। মূলত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বই সরবরাহ হয় জেলা সাক্ষরতা পর্যদ থেকেই। কিন্তু ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠতে গিয়ে মুখ্য অনুপ্রেরক কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্থানীয় কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে বই সংগ্রহ করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। তাতে চাহিদার কিছুটা যোগান দেওয়া গেছে। শুধু বই পড়াই নয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পঠনের অভ্যাস, জানার পরিধি এবং বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতাকে আরো বাড়ানোর জন্যে অগ্রণীদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে ১টি করে পাঠচক্রের অনুষ্ঠান হচ্ছে এই কেন্দ্রেই।

এই মুখ্য কেন্দ্রের সঙ্গে আরো ৮টি জনশিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। কেন্দ্রে পঠন পাঠনের পাশাপাশি স্ব-নির্ভর হবার লক্ষ্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে পড়ুয়া / অংশগ্রহণকারীরা যুক্ত রয়েছেন। এই মুহূর্তে এঁরা ১৪৪টি SHG এবং ১২টি SGSY গ্রুপে যুক্ত রয়েছেন এবং 'প্রাণীপালন' ও 'ধান থেকে চাল তৈরি'-র মাধ্যমে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কেনাবেচা করে আর্থিক স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখছেন। ফলে 'পরনির্ভরতা ছেড়ে নিজেরাই কিছু করব' এই মানসিকতায় এঁদের পাশাপাশি অন্যান্য মানুষরাও উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এই উদ্বুদ্ধ করানো এবং স্ব-নির্ভরতার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের সঠিকভাবে পরিচালনা ও পরামর্শ দেওয়ার কাজটি মুখ্যকেন্দ্রও তৎসহ অন্যান্য কেন্দ্রগুলির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে। এছাড়া মুখ্যকেন্দ্রও তৎসহ অন্যান্য কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন দিবসগুলি পালন করে। যেমন নেতাজির জন্মদিন, প্রজাতন্ত্র দিবস, ভাষা দিবস, নারী দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস ও তিরোধান দিবস, মাতৃসচেতনতা দিবস। পাশাপাশি

মুখ্যকেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে প্রতি মাসে অন্তত একটি করে সংগঠিত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে এই মুখ্যকেন্দ্রটি বিশেষ সাড়া ফেলেছে। মুখ্য অনুপ্রেরক কেশব চ্যাটার্জীর পরিচালনায়, সহায়ক কেন্দ্রের সঞ্জয় মালিকের লেখা নাটক 'আলোর খোঁজে' জনশিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই নাটকটি ব্লকস্তর, জেলাস্তর এবং রাজ্যস্তরে বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দিবসে একাধিকবার রাজ্যস্তরে এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। 'বিদ্যাসাগর মেলা'-য় বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি আয়োজিত রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতাতেও এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। এ বারেও জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাতে এটি রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এটি মঞ্চস্থ হয়েছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পড়ুয়ারা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং লেখক নিজেও রয়েছেন। মূলত সাক্ষরতা আন্দোলনে জড়িত মানুষজনকে নিয়ে নাটকটি করা হচ্ছে বলে এটি এত প্রাণবন্ত।

এই কেন্দ্রের একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাননীয়া প্রধান কল্পনা মালিক। তিনি একদা একদম নিরক্ষর ছিলেন। পরে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাক্ষর হয়েছেন। বর্তমানে চিঠি পড়তে পারেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন যথাযোগ্য ভাবে। নাটকও করছেন কেন্দ্রের টিমের সঙ্গে ঘুরে। আবার ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোতেও উদ্যোগ নিয়েছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের পাশাপাশি এই কেন্দ্রটি স্বাস্থ্য সচেতনতার অভিযানে এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শৌচাগার, পালস পোলিও প্রভৃতি কর্মসূচিতে পঞ্চায়েতের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যান্য অনুপ্রেরকরাও এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন।

মুখ্যকেন্দ্রের এই বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করার পাশাপাশি এলাকায় নিরক্ষর/ স্বল্প সাক্ষরদের জন্য সহায়ক কেন্দ্রের সঞ্জয় মালিক এবং শেফালী

বাগ তাঁদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছেন। মুখ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে সমমান কর্মসূচির জন্য সমীক্ষা চলছে। খুব দ্রুতই এটি শেষ হয়ে যাবে। প্রস্তুতি চলছে জুন-জুলাই শিক্ষাবর্ষ থেকে এই কর্মসূচি যেন সুষ্ঠুভাবে চালু করা যায়। অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনশিক্ষা আন্দোলনে জেলার বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিজস্ব প্রচেষ্টায় নানা আকর্ষণীয় কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্যেই ইলছোবা-দাসপুরের মুখ্য কেন্দ্রটি জেলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নিতে পেরেছে। সংগঠক-কর্মীদের স্বচ্ছ ধারণার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। কীভাবে জনশিক্ষা কেন্দ্রকে জনগণের নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত করা যায় তার এক বিরল দৃষ্টান্ত ইলছোবা-দাসপুর (শরৎচন্দ্র) মুখ্য জনশিক্ষা কেন্দ্র।

‘প্রবাসী’ পত্রিকা থেকে ১৯০১ সালের জনগণনার প্রতিবেদন

কলিকাতা*

লোকসংখ্যা।

১৯০১ সালের সেন্সস্ (আদমসুমারি বা মানুষগণনা) অনুসারে সহরতলী, কিল্লা ও বন্দরসমেত, কলিকাতার লোকসংখ্যা ৯৪৯,১৪৪। ১৮৭২, ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের সেন্সসে লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৭০৬,৫১১, ৬৮৪,৭১০ এবং ৭৬৫,৫১০ ছিল। সুতরাং ৩০ বৎসরে ২৪২,৬৩৩ অর্থাৎ শতকরা ৩১.৭ জন লোক বাড়িয়াছে।

স্ত্রী ও পুরুষ।

কলিকাতায় পুরুষের সংখ্যার তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এখানে ৬২৪৮৫৫ জন পুরুষ ও ৩২৪২৮৯ জন স্ত্রীলোকের বাস। পুরুষের সংখ্যার তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া চলিতেছে। বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৩৫৮৩৩৬, কিন্তু বিবাহিতা নারীর সংখ্যা ১৩১৮১৬। মোটের উপর এইরূপ ধরা যাইতে পারে যে কলিকাতাবাসিনী বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের পতিগৃহে পতির সহিত বাস করিতেছেন। তাহা হইলে ২২৬৫২০ জন কলিকাতাবাসী স্বামী অস্ত্রীক বাস করিতেছেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে কলিকাতায় বাসা খরচ, বিশেষতঃ বাড়ীভাড়া, মফঃস্বল অপেক্ষা অনেক বেশী। এইজন্য বেশী রোজগারের আশায় যে সকল গরীব লোক কলিকাতা যায়, তাহারা স্ত্রীদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীপুরুষের সংখ্যায় পার্থক্যের আর একটা কারণ এই যে কলিকাতায় অনেক বালক ও যুবক পড়িতে আসে, কিন্তু সে পরিমাণে ছাত্রীর আমদানী হয় না। মানুষ পরিবারী হইয়া বাস না করিলে অনেক সময়েই দুর্নীতিপরায়ণ হয়। ইংরাজশাসনের

* এই প্রবন্ধে কলিকাতার অর্থ সহরতলী সমেত বুঝিতে হইবে। - (প্রবাসী)

প্রথমাবস্থায় ইংলণ্ড হইতে যাতায়াতের অসুবিধাবশতঃ এদেশে বেশী ইংরাজ স্ত্রীলোক না থাকায় ইংরাজ পুরুষদের চরিত্র অনেক স্থলে বড় জঘন্য ছিল। রেলওয়ের পূর্ব্বেকার সময়ের প্রবাসী বাঙ্গালীদেরও এই কারণে দুর্নাম আছে। কলিকাতায় স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার এত পার্থক্য বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা না কমিলে কলিকাতায় দুর্নীতির স্রোত বাড়িয়া চলিবে।

ধৰ্ম্ম

কলিকাতার ৬১৫৪৯১ জন অধিবাসী হিন্দু, ২৮৬৫৭৬ মুসলমান, ৩৮৫১৫ খৃষ্টান, ২৯০৩ বৌদ্ধ, ১৮৮৯ ইহুদী, ১৮১২ ব্রাহ্ম, ১২৪১ জৈন, ২৯০ পার্সী, ১৭৮ কংকুচ্-পন্থী, ১৫৩ শিখ, এবং ১৭ জন অন্যান্য ধৰ্ম্মাবলম্বী। সুতরাং এই সহরে হিন্দুর সংখ্যাই খুব বেশী। ১৮৯১ সাল হইতে ১০ বৎসর হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ২৪.১, মুসলমানের ২৩.০১, খৃষ্টানের ৩০.৭৯, ব্রাহ্মের ১৫৪, জৈনের ১৫১, পার্সীর ৭৫ এবং ইহুদীর ৩৫ জন বাড়িয়াছে।

জাতি, বর্ণ, ইত্যাদি।

কলিকাতাবাসী হিন্দুদের মধ্যে নিম্নলিখিত জাতিগুলির সংখ্যাই অধিক ঃ—ব্রাহ্মণ, ৮৮৬১০; কায়স্থ, ৭১৭৫৭; কৈবৰ্ত্ত, ৪৫৭১৮; সুবর্ণবণিক, ২৬৫২৬; চামার, ২৯৬১০; গোয়ালা, ২৬২৮৪; তাঁতি ২২৪৫৩। বৈষ্ণব, নাপিত, ধোবা ও গন্ধবণিক, এই চারি জাতির প্রত্যেকের সংখ্যা দশহাজারের অধিক। তাঁতি ও সুবর্ণবণিকদিগের মধ্যে শতকরা ৪৬ জন স্ত্রীলোক। কায়স্থদের শতকরা ৩৭ জন স্ত্রীলোক। ব্রাহ্মণ ও কৈবৰ্ত্তদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩ ও ৩৬।

মোট ২৮৬৫৭৬ জন মুসলমানের মধ্যে ২৬২০৮৭ জন শেখ। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে শেখের সংখ্যা শতকরা ৯১ জন। তাহারা সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের প্রায় তিনগুণ। পাঠানদের সংখ্যা ১৪৫৩১, সৈয়দদের ৭৫৮৬, মোগলদের ১৭৯৯। বাকী মুসলমান জোলা, লালবেগী (মেথর) ও হজম্ (নাপিত)।

৩৮৫১৫ জন খৃষ্টানের মধ্যে ১৪৬৬৩ ফিরিঙ্গী, ৮৯৪৩ দেশী খৃষ্টান এবং ৮৪৯০ ইংরাজ।

কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে কেবল ফিরিঙ্গী ও ইহুদীদিগের ভিতরই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অনক বেশী।

বয়স, বিবাহ, ইত্যাদি

কলিকাতাবাসী হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে এক হইতে দুই বৎসর বয়স্ক শিশু অপেক্ষা এক বৎসরের কম বয়সের শিশুর সংখ্যা খুব বেশী। ইহার অর্থ এই যে এক বৎসর পার হইবার আগেই অনেক শিশু মারা যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়;—কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুসংখ্যা বড় বেশী। মৃত্যুর কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা, এবং সাধারণতঃ যে দুধ পাওয়া যায়, তাহার চড়া দাম ও বিশুদ্ধতার অভাব। তদ্ভিন্ন মাতাদের অল্প বয়সও শিশুমৃত্যুর আর একটি কারণ। সূতিকাগার সমূহের জঘন্যতাও উল্লেখযোগ্য।

বিবাহিত, বিপত্নীক, বিধবা ও অবিবাহিতের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ।

	পুরুষ	*স্ত্রী*
অবিবাহিত	১৯৯৭৮৬	৮২৩৬৫
বিবাহিত	৩৯৭৩৩৩	১৫০৭০২
বিধবা বা বিপত্নীক	২৭৭৩৬	৯১২২২

এক হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একজন বিপত্নীক ও ৩৭টি বিধবা আছে!

১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বিবাহিত বালকবালিকার সংখ্যার একটি তালিকা দিতেছি।

	বালক	*বালিকা*	*মোট*
হিন্দু	৪১৪৬	১১১৬৩	১৫৩০৯
মুসলমান	২৩২০	৩৫৯৬	৫৯১৬
খৃষ্টান	০	৫০	৫০
বৌদ্ধ	৯	৯	১৮
ইহুদী	৯	৮	১৭
ব্রাহ্ম*	১৮	১২	৩০
জৈন	১৮	১৮	৩৬
অন্যান্য	৫	২	৭

* ১৮র ন্যূনবয়স্ক ব্রাহ্ম বালকের বিবাহ আইন বিরুদ্ধ। এইজন্য এই সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকবালিকার প্রতি দশহাজারে কতজন বিবাহিত।

	বালক	বালিকা	মোট
হিন্দু	৪৮.৯	১৩১.৬	১৮০.৫
মুসলমান	২৭.৩	৪২.৪	৬৯.৭
খৃষ্টান	০	০.৬	০.৬
বৌদ্ধ	০.১১	০.১১	০.২২
ইহুদী	০.১১	০.১০	০.২১
ব্রাহ্ম	০.২১	০.১৪	০.৩৫
জৈন	০.২১	০.২১	০.৪২
অন্যান্য	০.০৫	০.০২	০.০৭

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অনেক অধিক প্রচলিত।

অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে অনুপাতে বিধবার সংখ্যা অধিক। ১৫ বৎসরের অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা হিন্দুনারীর সংখ্যা খুব কম, মোট ৩০৬৩। তন্মধ্যে ১৭৮ জনের বয়স ৬০ বৎসরের উপর। ইহাঁরা সম্ভবতঃ কুলীনকন্যা।

কাহার এবং চামারেরা আর সকল জাতি অপেক্ষা তাহাদের পুত্রদের অল্প বয়সে বিবাহ দেয়। অবিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা বৈদ্যদের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, —পুরুষ শতকরা ৪৬.৩ ও স্ত্রীলোক ২৯.৯, তার নীচে সুবর্ণবণিকেরা,—৪৩.৭ পুরুষ এবং ২৮.৩ স্ত্রীলোক।

কলিকাতায় পাঁচ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ১১৩টি হিন্দুপতি ও ১২৭টি হিন্দুভার্য্যা আছেন। পতিদের মধ্যে ১৫টি কায়স্থ, ৬টি ব্রাহ্মণ, ৪টি চামার, এবং দুইটি করিয়া ছত্রী ও ক্ষত্রী। এইসকল জাতির মধ্যে এই বয়সের বধু একটিও নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত ঐ ঐ জাতির পতিমহাশয়দিগের গৃহিণীরা এখনও প্রোষিতভর্ত্তৃকা; অথবা তাঁহারা এখনও ঘর করিতে আসেন নাই।

শিক্ষা

কলিকাতায় শতকরা ৭৬.৪ জন লোক অর্থাৎ ৭২৪৯৭৪ জন নিরক্ষর। শতকরা ২৩.৬ জন অর্থাৎ সিকিরও কম লোক লিখিতে পড়িতে পারে। তন্মধ্যে শতকরা ২০ জন পুরুষ ও ৩.৬ জন স্ত্রীলোক। ভারতবর্ষের রাজধানীর এই দশা! কেবল স্ত্রীলোক ধরিলে তাহাদের মধ্যে শতকরা ১০.৬ জন লিখনপঠনক্ষম। কেবল পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩০.৪ জন লেখাপড়া জানে, অর্থাৎ একবারে নিরক্ষর নহে। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইয়াছে। ১৮৯১ সালে স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৪.৮ জন লেখাপড়া জানিত বা শিখিতেছিল; ১৯০১ সালে তাহাদের মধ্যে শতকরা ১১.৫ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল।

কলিকাতায় ৬ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ১২৪২৮০ জন বালক ও ৭৭২৮৪টি বালিকা আছে। তন্মধ্যে শতকরা ৩৭ জন বালক ও ১৭.৫ বালিকা লিখিতে পড়িতে পারে। ভারতের রাজধানীতে শতকরা ৬৩ জন বালক ও ৮২.৫ বালিকা শিক্ষা পাইতেছে না বা পায় নাই।

শতকরা কতজন লিখনপঠনক্ষম

	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৩৫.৫	৯.৭
মুসলমান	১৬.৫	২.৯
খৃষ্টান	৮২.৩	৬৯.৮
ব্রাহ্ম	৬৬.৪	৫৩.১
বৌদ্ধ	৪১.৩	১৫.৯
ইহুদী	৬৫.৭	৪৪.৮

ইংরাজী শিক্ষিতেরতালিকা।

	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	১৪.৪	.৭
মুসলমান	২.৮	.১
দেশীখৃষ্টান	২৩.৮	৩৪.০
ব্রাহ্ম	৪১.৮	৩৭.৯

বৌদ্ধ	১০	৪.৬
ইহুদী	৪৯	২০.২

সহরতলী বাদে কেবল কলিকাতা সহরের লেখাপড়া জানা শতকরা ২৪.৮ জন লোকের মধ্যে ১৬.২৫ জন বাঙ্গলা জানে, ৪.১৬ হিন্দুস্থানী, ২.৭৩ ইংরাজী এবং ০.৫ ওড়িয়া। ১৩৭৮০৩ বঙ্গভাষাজ্ঞলোকের মধ্যে ৮০৯০০ অর্থাৎ শতকরা ৫৮.৭ শুধু বাঙ্গলা লিখনপঠনক্ষম, ৫৬৯০৩ অর্থাৎ শতকরা ৪১.৩ বাঙ্গলা ইংরাজী দুই জানে। ৩৫৩১১ হিন্দুস্থানীজ্ঞলোকের মধ্যে ৩১৫০৪ অর্থাৎ শতকরা ৮৯ কেবল হিন্দুস্থানী জানে। কেবল ৩৮০৩ অর্থাৎ শতকরা ১১ জন ইংরাজীও জানে। লিখনপঠক্ষম ওড়িয়াদের মধ্যে কেবল শতকরা ২ জন ইংরাজীও জানে। নারীদের মধ্যে ২৮১৯ ইংরাজী ও বাঙ্গলা, ২৭৭ ইংরাজী ও হিন্দী, ০ ইংরাজী ও ওড়িয়া জানেন।

খাস কলিকাতায় লিখনপঠনক্ষমের অনুপাত।

	মোটসংখ্যা	"শিক্ষিত"*	শতকরা
বঙ্গভাষী	৪৩৪৯৮৪	১৩৭৮০৩	৩১.৬
হিন্দীভাষী	৩১৮৬৩৫	৩৫৩১১	১১.১
ওড়িয়াভাষী	৩০৬৩০	৪৫১৩	১৪.৭
ইংরাজীভাষী	২৮৫২৮	২৩১৯৫	৮১.৩
উর্দ্দুভাষী	২৪৪২৪	৪৪৬২	১৪.১

হিন্দুদিগের মধ্যে কোন্ জাতির শতকরা কয়জন পুরুষ ও স্ত্রী লেখাপড়া জানে, তাহা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। বৈদ্য, পুরুষ ৭০, স্ত্রী ২৯.১; কায়স্থ, ৬১.২, ২৬†; ব্রাহ্মণ, ৬০.৬§, ১৯.২; সদ্‌গোপ, ৫৯.৩, ১১; শুঁড়ি, ৫২, ৪.৭; সুবর্ণবণিক, ৫৭.৯, ৮.১; গন্ধবণিক, ৫১, ৬.২; ছত্রী, ৪০.৪, ৫.১; ক্ষত্রী, ৩৮, ৭.৩; তেলী, ৩৪, ৬.৪; তাঁতি, ৩৩.৬, ৬.৭; ময়রা, ৩৩.৫, ৫.৭, নাপিত, ২৮.১, ৪.৪; কৈবর্ত্ত, ২৭.১, ৪.৫; বৈষ্ণব, ২৬.৯, ৪.৫; গোয়ালা, ২২, ৪.৩। বৈদ্যদের মোট সংখ্যা কম। তাঁহাদের অনেকে চিকিৎসা ব্যবসার অনুসরণ বা

*"শিক্ষিত" অর্থে, নিরক্ষর নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

†তন্মধ্যে ৫৮ বাঙ্গালী এবং ২.১ হিন্দুস্থানী। §তন্মধ্যে ৪৭ বাঙ্গালী, ১০.৫ হিন্দুস্থানী এবং ১.৮ ওড়িয়া।

শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহারা কি স্ত্রী কি পুরুষ অন্য সকল হিন্দুজাতি অপেক্ষা শতকরা অধিকজন লিখনপঠনক্ষম। হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা খুব কম। তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে ধরিলে তাহাদের মধ্যে শতকরা লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হয়। এই কথা কায়স্থদের সম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে খাটে। বাঙ্গলা লেখাপড়াজানা লোক বৈদ্যদের মধ্যে শতকরা ৬৯ জন, সদ্‌গোপদের মধ্যে ৫৯, কায়স্থদের মধ্যে ৫৮, সুবর্ণবণিকদের মধ্যে ৫০, এবং ব্রাহ্মণ ও গন্ধবণিকদের প্রত্যেকের মধ্যে ৪৭। ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিরক্ষর হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া অনেক থাকায় তাহাদের অঙ্ক এত কম। ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় মুসলমান পুরুষ স্ত্রী শতকরা কয়জন লেখাপড়া জানা, তাহাও জানা দরকার। মোগলপুরুষ, ❖ ৪১.৭, স্ত্রী, ১২.৯; সৈয়দ, ২৯.২,✢ ৭.৪; পাঠান, ২০.১, ☆ ৫.৮; শেখ, ✪ ১৫.৫, ২.৬।

ইংরাজী শিক্ষিতের তালিকা।

হিন্দু

জাতি	মোট পুরুষ	"শিক্ষিত"	শতকরা কত
ব্রাহ্মণ	৫৫৬৭১	১৭১৩২	৩১
কায়স্থ	৪২৭৭৯	১৫৮৩৫	৩৭
সুবর্ণবণিক	১৩৮৯৭	৩৭৩১	২৭
কৈবর্ত্ত	২৪১২০	১৯০৫	৮
বৈদ্য	৪০২৮	১৯০৪	৪৭
তাঁতি	১১০৪৩	১৮১৫	১৬
সদ্‌গোপ	৬২৬৮	১৪১৪	২৩

এই তালিকাতেও অনুপাতে বৈদ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া অনেক থাকায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ইংরাজীশিক্ষিতের সংখ্যা কম। ইংরাজ রাজত্বে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেও যে শিক্ষার বিস্তার

❖ইহাদের মধ্যে ১৪.৫ বঙ্গভাষী, ১০ হিন্দুস্থানী। ✢১০.৭ হিন্দুস্থানী, ১২.৩ বাঙ্গালী। ☆৭.৩ হিন্দুস্থানী, ১০.৭ বাঙ্গালী। ✪৪.১ হিন্দুস্থানী ৯.২ বাঙ্গালী। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কলিকাতা প্রবাসী লেখাপড়া জানা মুসলমানদের অধিকাংশ বঙ্গভাষী।

হইতেছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কলিকাতায় শতকরা ৮.৬ চামার, ৬.৪ ধোবা, ২.৬ হাড়ি, ২.৪ কেওরা, ৫.২ লালবেগী (মেথর), ৩.৩ মুচি এবং ৩.৪ তিয়র লেখাপড়া জানে।

ইংরাজী শিক্ষায় মুযলমানেরা বড় পশ্চাৎপদ। বাঙ্গালী-খৃষ্টানদের শতকরা ৪৮.৭ জন পুরুষ ইংরাজী জানে; ব্রাহ্ম ৪১.৮, পার্সী, ৬৮.৪।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেশীখৃষ্টান নারীগণ শতকরা ৭১.৬ জন ইংরাজী জানেন; পার্সী, ৪০.৫, ব্রাহ্ম, ৩৭.৮, ইহুদী, ২৬, বৈদ্য, ২.৭, কায়স্থ, ২.৩, ব্রাহ্মণ, ১.৫, সুবর্ণবণিক, ০.৭, শেখ, ০.১, তাঁতি, ০.৪, কৈবর্ত্ত, ০.৩; সদ্‌গোপ, ০.৬। বাঙ্গালী-খৃষ্টানদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোক ইংরাজী জানে।

ভাষা

ভাষা	১৯০১		১৮৯১	
	মোট	শতকরা	মোট	শতকরা
বাঙ্গলা	৪৩৪৭৯৬	৫১.৩	৩৭৫৫২৮	৫৫.১
হিন্দুস্থানী	৩৪৩০৫৯	৩৭.৬	২৪৭৬৪৫	৩৬.৩
ওড়িয়া	৩০৬৩০	৩.৬	২৩৮৯৯	৩.৫
ইংরাজী	২৮৫২৬	৩.৪	২৩২১৫	৩.৪

এই তালিকাটি সহর কলিকাতার। দশবৎসরে সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানীই অধিক বাড়িয়াছে। ইহার কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধিহেতু বিস্তর হিন্দুস্থানী কুলিমজুর, চাকর, দরওয়ান এবং মাড়োয়ারী ব্যবসাদার বৎসর বৎসর কলিকাতায় আসিতেছে। কলিকাতাকে আধ-হিন্দুস্থানী সহর বলিলেও চলে। বড়বাজার, কলুটোলা, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিঙ্গা, বামনবস্তী, ও হেষ্টিংস ওয়ার্ডে অর্দ্ধেকের উপর হিন্দুস্থানী। বৌবাজার, ফেনউইক বাজার, ওয়াট্‌গঞ্জ, কিল্লা ও বন্দরে অধিকাংশ লোক হিন্দুস্থানী।

কলিকাতার ৫৭টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। তন্মধ্যে ৪১টি এশিয়ার ১৬টি এশিয়ার বাহিরের।

লোকের আমদানী

কলিকাতাবাসীদের শতকরা ৩১.৯ জনের কলিকাতায় জন্ম, বাকী ৬৮.১

জনের জন্ম অন্যত্র। কলিকাতার চারিপাশের গ্রামের লোকেরা ক্রমশঃই কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেছে। কারণ, ঐ সকল গ্রাম অপেক্ষা কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল। বেহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক কলিকাতায় আসিয়াছে। উত্তরপশ্চিম হইতে আসিয়াছে, ১০৬৪৩০; রাজপুতনা হইতে ১৪৯৪৭; পাঞ্জাব হইতে ৬৫৯৯; বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, ২৮০৫; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, ১৯১৯।

ব্যাধি।

কলিকাতায় ৪৭৪ জন পাগল, ৩৩৫ জন বোবা-কালা, ৬৯৬ জন অন্ধ ও ২৪২ জন কুষ্ঠরোগীর বাস! প্রায় অর্দ্ধেক অন্ধলোক মুসলমান। ইহার কারণ নির্ণীত হয় নাই। খৃষ্টানদের মধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত, বিশেষতঃ পাগল ও কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহার একটি কারণ, অনেকে কুষ্ঠাদির লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র খৃষ্টান হয়। মোগলদের মধ্যে পাগল, অন্ধ ও বোবা-কালার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পাঠানদের মধ্যেও খুব বেশী। ফিরিঙ্গীদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংরাজ পুরুষ ও রমণীদের মোট সংখ্যার হিসাবে তাহাদের মধ্যে পাগলের সংখ্যা বেশী। হিন্দুজাতিদের মধ্যে ক্যাওরা পাগল, বোবা-কালা ও অন্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। হিন্দুকুষ্ঠরোগী হাড়িদের মধ্যে সর্ব্বাধিক। বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ নির্ণয় সহজ নহে, কিন্তু অত্যাবশ্যক। কেন না, কারণ নির্ণীত হইলে ঐ সকল জাতির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি সহজ সাধ্য হয়, এবং রোগগুলিরও কারণ নিরূপিত হইয়া যায়।

ব্যবসা ও জীবিকা।

এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। এখন আমরা কয়েকটি কথামাত্র বলিব। যাঁহারা বিদ্যাসাধ্যবৃত্তি ও শিল্পীর ব্যবসার অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন (the learned and artistic professions), তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ২০.৬ জন খৃষ্টান, ৬৯.৩ জন হিন্দু এবং ১৫.৭ জন মুসলমান; অর্থাৎ খৃষ্টানদের মোট সংখ্যা হিসাবে যত হওয়া উচিত তাহার প্রায় ৫ গুণ, হিন্দুদের যত হওয়া উচিত তদপেক্ষা কিছু বেশী, এবং মুসলমানদের যত হওয়া উচিত, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক। সুতরাং দেখা হইতেছে, যে লেখাপড়াজানা

হিন্দুরা অতিরিক্ত মাত্রায় ওকালতী, মাষ্টারী প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করে এইরূপ যে একটা ধারণা আছে, তাহা ভুল।

কলিকাতায় বেশ্যাদের মধ্যে শতকরা ৮৮.৯ জন হিন্দু, ১০.৩ মুসলমান, ০.২ জন খৃষ্টান এবং ০.৫ অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, হইতে আগত। অথচ কলিকাতার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুরা শতকরা ৬৫ জন মাত্র। সুতরাং হিন্দুসমাজ হইতে এত অধিক বেশ্যার উদ্ভব, হিন্দুহিতৈষী মাত্রেরই চিন্তার বিষয়। মুসলমান ও খৃষ্টানেরা কলিকাতার সমুদয় অধিবাসীর মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ৩০ ও ৪ জন। সুতরাং সংখ্যার হিসাবে তাহাদের মধ্যে বেশ্যা কম। হিন্দুজাতির মধ্যে কৈবর্ত্ত বেশ্যা ২৩৮৬, সুবর্ণ বণিক ১৮৮৪, কায়স্থ ১৪৬৯, ব্রাহ্মণ ১০৪৮, সদ্‌গোপ ৮৪১, তাঁতি ৮১৪ এবং গোয়ালা ৬৮১। তাহাদের মোট সংখ্যার হিসাবে কৈবর্ত্ত ও সুবর্ণবণিকদের মধ্যে বেশ্যার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

উচ্চরাজপদের শতকরা ৪৪টি খৃষ্টানদের অধিকৃত, ৪৮.৮টি হিন্দুদের ও ৫.৪টি মুসলমানদের। খৃষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান পুরুষদের মধ্যে লেখাপড়াজানা যথাক্রমে শতকরা ৮২.৩, ৩৫.৫ ও ১৬.৩ জন। কিন্তু কলিকাতার সমগ্র অধিবাসীর তুলনায় খৃষ্টান শতকরা ৪, মুসলমান ৩০ ও হিন্দু ৬৫ জন। সুতরাং খৃষ্টানেরা বড় অধিক মাত্রায় উচ্চপদগুলি একচেটিয়া করিয়াছেন ও মুসলমানেরা অত্যন্ত কম পাইয়াছেন। হিন্দুরাও সংখ্যানুসারে যথেষ্ট উচ্চপদ পান নাই। শিক্ষার ন্যূনাধিক্য একটা কারণ বটে, কিন্তু শ্বেতচর্ম্মা খৃষ্টানদের ন্যায়পরতার অভাবও আর একটা কারণ। তাঁহারা প্রায় সমস্ত ভাল চাকরী হইতে দেশবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জাতীয় ব্যবসায়

প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে কর্ম্মভেদে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন কিন্তু জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কলিকাতার সেন্সস্ হইতে তাহার বেশ ভাল প্রমাণ পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায়, যে উচ্চজাতির হিন্দুরা খুব বেশী পরিমাণে তাহাদের জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা তত পরিণামে পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসা ত্যাগ করে নাই। কয়েকজন ধোবা রাজকার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়া থাকিলেও এবং এক-চতুর্থাংশ ধোবা জাতীয় ব্যবসা না করিলেও, অধিকাংশ ধোবা এখনও

কাপড় কাচে। কাহারদিগের দুই পঞ্চমাংশ পাল্কী বহে। বাঙ্গালী মুচিরা এখনও বুট ও জুতা তৈয়ার করে, কিন্তু বেহারী চামারেরা অন্যান্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুম্ভকারদের অতি অল্প লোকেই হাঁড়ি গড়ে। কৈবর্ত্ত, তাঁতি ও তেলীরা খুব অধিক পরিমাণে কুলক্রমাগত বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। সুবর্ণবণিকেরা অনেকেই তেজারতী করিতেছে। কায়স্থদের অধিকাংশ লেখনী ছাড়িয়া ব্যবসা ও ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। বৈদ্যদের অধিকাংশ চিকিৎসা-বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রতি আটজনের মধ্যে কেবল একজন ব্রাহ্মণের উপজীবিকা কৌলিক বৃত্তি।

কোন্ জাতির মোট উপার্জ্জক লোকদের মধ্যে শতকরা কয়জন কৌলিক ব্যবসা বা বৃত্তির অনুসরণ করে, তাহা লিখিত হইতেছে। ধোবা ৮৪.২, হাঁড়ি ৬৯.৩, ডোম ৬৮.৪, লালবেগী (হিন্দু) ৬৭.৯, তিয়র ৬৪.১, কৈবর্ত্ত (জেলে) ৬০.৩, হালুয়াই ৫৯.২। কলিকাতা সহরে ব্রাহ্মণ ১৩, কায়স্থ ৩০.৪, কৈবর্ত্ত (চাষী) ২.৭, তাঁতি ৬.২, তেলী ১০, ইত্যাদি। সেন্সসের ইংরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ লিখিয়াছেন, ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রভাবে তাঁতিদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। সহরতলীতে ব্রাহ্মণ ২৮, কায়স্থ ২৯.৯, গোয়ালা ২৬.৪, কৈবর্ত্ত ৭.২, চামার ৯.৭, নাপিত ৪২.৯, কাহার ৩৯.৩, ছত্রী ২৮.৮, সুবর্ণবণিক ১৫.৮, মুচী ৩০.৪, সূত্রধর ৪৯.০, গন্ধবণিক ৩৭.৭, স্বর্ণকার ৪৯.৬।

এ বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে। তাহা পরে লিখিবার চেষ্টা করিব।

প্রবাসী পত্রিকার বাংলা ১৩১০ সনের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধটির ভাষণ ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। নিবন্ধটি গৌতম ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ভারতের সাক্ষরতা সম্পর্কিত কিছু দরকারি তথ্য

- বর্তমানে প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচির (CEP)-র অন্তর্ভুক্ত জেলা : ২৯৬টি
- সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি (PLP)-র অন্তর্ভুক্ত জেলা : ১৬৫টি
- সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি (TLC)-র অন্তর্ভুক্ত জেলা : ১৩৬টি
- এখনও যে জেলাগুলিতে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান বা অনুসারি কার্যক্রম শুরু হয়নি : ৩টি
- জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের সবকটি প্রকল্পের মাধ্যমে সাক্ষর হওয়া মানুষের সংখ্যা : ১১.৯৯ কোটি
- সবকটি প্রকল্পের মাধ্যমে সাক্ষর হওয়া মানুষদের মধ্যে নারীদের হার : ৬১%
- তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের হার : ২৩%
- তফশিলি উপজাতির মানুষদের হার : ১২%
- মোট রাজ্য উপকরণ কেন্দ্রের সংখ্যা : ২৬টি
- জনশিক্ষণ সংস্থানের সংখ্যা : ১৫৭টি

২০০১ সালে জনগণনার চূড়ান্ত তথ্য অনুসারে —

- সর্বমোট সাক্ষরতার হার ৬৪.৮৪%
  পুরুষদের মধ্যে ৭৫.২৬%
  নারীদের মধ্যে ৫৩.৬৭%
- এক দশকে (১৯৯১-২০০১) সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি :
  সর্বমোট ১২.৬৩%
  পুরুষদের ১১.১৩%
  নারীদের ১৪.৩৮%
  এই পরিমাণ বৃদ্ধি আগে কখনও হয়নি।
- পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হারে পার্থক্য ২৪.৮৪% থেকে এক দশকে কমে হয়েছে ২১.৫৯%। এই পার্থক্য সব থেকে কম মিজোরামে (৩.৯৭%), তারপর কেরালায় (৬.৫২%) এবং মেঘালয়ে (৫.৮২%)
- এই প্রথম দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা এক দশকে কমেছে। এখন দেশে নিরক্ষরের থেকে সাক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশি।

বিগত দশকে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কমেছে ২.৪৭ কোটি। সাক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ২০.১৪ কোটি।

- বিহার ছাড়া এখন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৬০% এর বেশি।
- সাক্ষরতার হারের শীর্ষে এবারও রয়েছে কেরালা (৯০.৮৬%)। সবার শেষে, ৩৫ তম স্থানে আছে বিহার (৪৭.০০%)
- বিগত দশকে সাক্ষরতার হার সব থেকে বেশি বেড়েছে রাজস্থানে (২১.৮৬%)। সব থেকে কম বেড়েছে বিহারে (৮.৫২%)। নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার সব থেকে বেশি বেড়েছে ছত্তিশগড়ে (২৪.৩৩%)।
- দেশের ৭ ও তার বেশি বয়সী ৮৬.৪৮ কোটি মানুষদের মধ্যে এখন নিরক্ষরের সংখ্যা ৩০.৪১ কোটি।
- ১.৫ কোটির বেশি নিরক্ষর মানুষ আছেন ৮টি রাজ্যে (সব মিলিয়ে ৬৯.৭%)। রাজ্যগুলি হল — উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র।
- দেশের মোট নিরক্ষরদের ৪৮.১২% বাস করেন হিন্দিভাষী ৬টি রাজ্যে। রাজ্যগুলি হল উত্তরপ্রদেশ (৫.৮৯ কোটি), বিহার (৩.৫১ কোটি), রাজস্থান (১.৮২ কোটি), মধ্যপ্রদেশ (১.৮০ কোটি), ঝাড়খণ্ড (১.০২ কোটি) এবং ছত্তিশগড় (০.৬১ কোটি)।
- দেশে ১৫-৩৫ বছর বয়সী মানুষের মোট সংখ্যা ৩৪.৭৭ কোটি, পুরুষ ১৭.৯২ কোটি, নারী ১৬.৮৫ কোটি। এদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে ১০.০৭ কোটি, ৩.৪০ কোটি এবং ৬.৬৭ কোটি।

স্বাধীনোত্তর কালে দেশে সাক্ষরতার হার (১৯৫১-২০০১) :

জনগণনার বছর	সাক্ষরতার হার			সাক্ষরতার হারে (%) পুরুষ-নারীর পার্থক্য
	মোট	পুরুষ	নারী	
১৯৫১	১৮.৩৩	২৭.১৬	৮.৮৬	১৮.৩০
১৯৬১	২৮.৩০	৪০.৪০	১৫.৩৫	২৫.০৫
১৯৭১	৩৪.৪৫	৪৫.৯৬	২১.৯৭	২৩.৯৮
১৯৮১	৪৩.৫৭	৫৬.৩৮	২৯.৭৬	২৬.৬২
১৯৯১	৫২.২১	৬৪.১৩	৩৯.২৯	২৪.৮৪
২০০১	৬৪.৮৪	৭৫.২৬	৫৩.৬৭	২১.৫৯

[সূত্র : পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর নভেম্বর ২০০৫]

সংকলন : **শক্তি মণ্ডল**

বিবৃতি

১৯৫৬ সালের সংবাদ রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে (৪নং ফর্ম) '**জনশিক্ষা ভাবনা**'-র স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি ঃ

১.	প্রকাশের স্থান	..	২৫/২ বারোয়ারিতলা রোড কলকাতা - ১০
২.	প্রকাশের সময়	..	ত্রৈমাসিক
৩.	প্রকাশকের নাম	..	শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
	জাতি	..	ভারতীয়
	ঠিকানা	..	২৫/২ বারোয়ারিতলা রোড কলিকাতা - ১০
৪.	মুদ্রকের নাম	..	শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
	জাতি	..	ভারতীয়
	ঠিকানা	..	২৫/২ বারোয়ারিতলা রোড কলিকাতা - ১০
৫.	সম্পাদকের নাম	..	শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
	জাতি	..	ভারতীয়
	ঠিকানা	..	২৫/২, বারোয়ারিতলা রোড কলিকাতা - ১০
৬.	স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	..	সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি ২৫/২, বারোয়ারিতলা রোড কলিকাতা - ৭০০ ০১০

আমি দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১ মার্চ ২০০৬ **স্বা ঃ দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী**

দ্বিতীয় বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা ● জানুয়ারি - মার্চ ২০০৬
Registration No. **WBBEN 12125/25/1/2003/PC/171** মূল্য : ১০ টাকা

'জনশিক্ষা ভাবনা'র পরবর্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে

সত্যেন মৈত্র স্মরণ সংখ্যা হিসেবে

এতে থাকছে :

- **The arrogance of the learned : Adult Education and Learning**
  — Alan Rogers
- **Dr. Satyen Maitra**
  — Bhaskar Chatterjee
- প্রয়াত সত্যেন মৈত্র স্মরণে
  — বিনয় চৌধুরী
- একজন যথার্থ কাজের মানুষ
  — অরিন্দম কোঙার
- আদর্শ বয়স্ক শিক্ষাবিদ
  — নির্মল দাশ
- সত্যেন মৈত্র : জীবন ও কাজ
  — রুচিরা দাশগুপ্ত
- সত্যেন মৈত্র : ফিরে দেখা
  — শক্তি মণ্ডল

সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতির পক্ষে দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক সুপারফাস্ট প্রিন্ট, ৩৬৬/সি, জি. টি. রোড (সাউথ), হাওড়া - ৩, হতে মুদ্রিত এবং ২৫/২ বারোয়ারিতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ হতে প্রকাশিত ।